বাতায়ন

বৈশাখী

‘তুমি আদিকবি কবিগুরু তুমি হে’

Batayan

অতিথি সম্পাদক ঃ তন্ময় চক্রবর্তী

সম্পাদিকা ঃ রঞ্জিতা চ্যাটার্জী

Volume 29 | May, 2022

A literary magazine with an International reach

বাতায়ন

Issue Number 29 : May, 2022

ISBN: 978-0-6487688-9-0

Guest Editor
Tanmoy Chakraborty, Kolkata

Editor
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Melbourne, Australia

Design & Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support
Susanta Nandi, India

Chief Editor & CEO
Anusri Banerjee
Perth, Western Australia
a_banerjee@iinet.net.au

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registration No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Photo Credit

Front Cover : Painting by Rabindranath Tagore — collected from Thakurbarir Chitrakala, Deys Publishing.

Inside Front Cover — Photo of Rabindranath Tagore — from "BALAKA", 1st edition published by Indian Press, Allahabad, India in 1916.

Title Page : Art by Supratik Mukherji, Perth, Western Australia.

Back Cover : Collected from Thakurbarir Chitrakala, Deys Publishing.

Inside Back Cover : The cottage in Urbana, Illinois, USA, where Rabindranath Tagore lived in 1912 for six months. Photo courtesy – Kajal Mukhopdhyay and Mousumi Dutta Roy, USA.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়র বদলে....

তন্ময় চক্রবর্তী

যুদ্ধের রাস্তায় গান

বৃষ্টির মত বোমার শব্দ রাস্তায়
কালো ধোঁয়ায় একলা বিদেশিনী, কি জানত ?
এ দুর্দিনে, সে গান রবিঠাকুর
মেয়েটি যেন পেরিয়ে যায় সীমান্ত।

শহর নাকি দখল হয়ে গেছে
দূরের থেকে নানান খবর ভাসে
তবুও এসব মনখারাপি দিনে
রাতের বেলা তোমার গানই আসে।

মৃত সৈনিক, হয়ত কবি ছিল
ছোট্ট বাড়ি। একটা নদীর ধার।
গভীর রাতে এল যখন ট্রাক
ভাঙা বাড়ি একটু আলোর ফাঁক
ভালোবাসা হারিয়ে গেল কার

তুমি তো রোজ জ্বালাও নতুন আলো
মৃত্যুপুরী ও অন্ধকারের গুহা।
হাতে হাত ধরে সরিয়েছি কত কালো

কেন যুদ্ধ হয় ? কে জানে ?
এ বৈশাখে শান্তি আনো ঠাকুর
কিচ্ছু চাইনা, যুদ্ধ যেন থামে।

'ভয় হতে তব অভয় মাঝে' প্রভু
আবার যুদ্ধ, আবার ধ্বংস, কে জানত
মধ্যরাতের গানের রাস্তা ধরে
মেয়েটি তখন পেরিয়ে গেছে সীমান্ত

বাতায়নের কবিপ্রণাম

"নিজের রোগ ও দুর্বলতাকে বিশ্বাস না করাই ভালো। তাদের অস্তিত্ব সংসারে আছে, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব শুধু দেহে-মনে নয়। মনের রোগ হচ্ছে আধি, অর্থাৎ কাজের ঝঞ্ঝাট, তার চেয়েও বেশী অকাজের ঝঞ্ঝাট, – সেইটেই আমাকে থেকে থেকে মারচে।" কিন্তু পাঁক বাদ দিয়ে চিংড়িমাছ ধরা চলবে না – তাই কোমর বেঁধে নিজেকে প্রায়ই বলি, "রবীন্দ্রনাথ, ঝঞ্ঝাট জিনিষটা নোংরা কিন্তু সেটা আসল জিনিস নয় – প্রদীপের তেলটা গায়ে মেখো না, কিন্তু আলো জ্বলুক, তার পরে প্রতিদিন সাফ করতে হবে দীপটা, ভয় কি, আলোর মূল্যে তার মাইনে উঠে যাবে – অকাজের চেয়ে কাজের ঝঞ্ঝাটও ভালো।"

৭ই অশ্বিন, ১৩৩৫, – নির্মলকুমারী মাহলানবীশকে একটি চিঠিতে এই কথাগুলি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু। তিনি বিশ্বকবি। বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। পরাধীন দেশমাতাকে এনে দিয়েছেন অপ্রত্যাশিত বিরল সম্মান। তবে শুধুই এটুকু তো নয়। তিনি ছিলেন এক একক প্রতিষ্ঠান, বা বলা ভালো, স্বয়ংসম্পূর্ণ এক পৃথিবী। লেখালেখির বাইরেও এক বিশাল কর্মযজ্ঞের তিনি হোতা। শত শত কাজের হাজারো ঝঞ্ঝাট তাঁকে বিচলিত করে নি। বৈশাখ মাস তাই বাঙালীর রবীন্দ্রস্মরণের মাস। যাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার আলোয় আমাদের দৃষ্টির উন্মেষ তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন না করে আমাদের উপায় কি ? ২০২২ এর বাতায়ন রবীন্দ্রসংখ্যা এমনই এক শ্রদ্ধার্ঘ্য।

রবীন্দ্রনাথ এমন একজন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সমাজচিন্তক ও শিল্পী যাঁকে ঘিরে ভাবনা ও কল্পনার অন্ত নেই। রবীন্দ্রচর্চা এক অন্তহীন বিষয়। দেশ ও কালের সীমা পার হয়ে রবীন্দ্রনাথ আজও নানা ভাবনা ভাবান। নতুন আলোয় ঘুরেফিরে তাঁকে এই দেখা আমাদের ফুরোবে না। এ যেন কবিগুরুর গানের সেই বাণীর রূপায়ণ – "আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না / সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।" এক জীবন এই চেনাজানা জন্য যথেষ্ট নয়। তাই আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস।

বাংলার বাইরে বাঙালীমানসে রবীন্দ্রনাথ কেমন রূপে ধরা আছেন সার্ধশতবর্ষেরও বেশী সময় পার হয়ে ? বিগত বেশ কয়েক বছরে "বাতায়ন রবীন্দ্রসংখ্যা"য় প্রকাশিত গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধে ধরা হয়ে থাকছে সেই ছবি। লেখাগুলি গবেষকের রবীন্দ্র মূল্যায়ন নয়। কবিগুরুকে একেবারে কাছের মানুষ ভেবে অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁর আসনখানি পেতেছেন যাঁরা তাঁদের রচনা সংকলিত করে প্রকাশিত হল ২০২২ এর বাতায়ন রবীন্দ্রসংখ্যা। সংখ্যাটিতে পাঠকেরা সহজ ভাললাগার উপাদান ও চিন্তার খোরাক দুইই পাবেন বলে আমাদের আশা।

পত্রিকার পক্ষ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই রবীন্দ্রসংখ্যার আমন্ত্রিত সম্পাদক সাহিত্যিক শ্রী তন্ময় চক্রবর্তীকে। তন্ময় শুধু প্রতিভাবান সাহিত্যিকই নয়, একজন আগাগোড়া রবীন্দ্র অনুরাগী মানুষ। তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকার এই সংখ্যাটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। ধন্যবাদ জানাই বাতায়ন সুহৃদ সুপ্রতীক মুখার্জীকে। এবারের রবীন্দ্রসংখ্যায় অন্যতম প্রধান আকর্ষণ তাঁরই সৌজন্যে পাওয়া প্রিয়দর্শী মুখার্জীর (অধ্যাপক জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লী) সংগৃহীত চীনা চিত্রকরের তুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিটি।

বাতায়ন পরিবারের সব সদস্যদের জন্য রইল শুভেচ্ছা আর ভালবাসা। রবীন্দ্রভাবনা ও রবীন্দ্রচর্চা ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বজুড়ে। "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে" দাঁড়াক রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। আর সেই কাজ আমরা আপনারা এভাবেই এগিয়ে নিয়ে যাই সামনের দিকে।

ধন্যবাদান্তে,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
বাতায়ন, গোষ্ঠী সম্পাদক

সূচীপত্র বাতায়ন

প্রিয়দর্শী মুখোপাধ্যায়

চীনা চিত্রকরের তুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 7

নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবির ঠিকানা শান্তিনিকেতন 9

সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়

জীবনীকারের চিন্তাধারা ও মনন – রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 12

শমীন্দ্র ভৌমিক

আবার ফিরে এলে 18

তপনজ্যোতি মিত্র

কবির গান 19

পল্লববরন পাল

পঁচিশে বৈশাখ মঞ্চে 20

গৌতম দত্ত

তুমিই ভরসা দুঃখে সুখে 21

পৃথা ব্যানার্জী

বাইশে শ্রাবণ 22

সৌমিত্র চক্রবর্তী

আপনাকে প্রণাম করিনি কোনোদিন 23

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ, শিশুমন ও তিনটি পোকা 24

মানস ঘোষ

সিলেবাসের বাইরে 27

রুমঝুম ভট্টাচার্য্য

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে 29

আনন্দ সেন

লক্ষ্মণরেখা 35

সুনন্দা বসু

আনন্দময়ী 45

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

"প্রিয় সখা হে" 47

শুভ্র দত্ত

রবিদাদুর জন্মদিন 50

মৌসুমী রায়

বর্ষা ও বনস্পতি 52

স্নিগ্ধা সেন

চিরসখা 54

সৈমন্তী বিশ্বাস সান্যাল

আপন রবীন্দ্রনাথ 57

অদিতি ঘোষদস্তিদার

নূতন প্রাণের চর 59

সুজয় দত্ত

কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে 64

প্রিয়দর্শী মুখোপাধ্যায়

চীনা চিত্রকরের তুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্যু পেই-হুং (১৮৯৫-১৯৫৩) ছিলেন চীনের আধুনিক চিত্রকলার প্রখ্যাত শিল্পী তথা শিল্পশাস্ত্রের শিক্ষাবিদ। তিনি ছিলেন দক্ষিণ চীনের চিয়াংসু প্রদেশের ইশিং শহরের অধিবাসী। ১৯১৬ সালে তিনি শাংহাইয়ের ফুতান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী ভাষা বিভাগে পড়াশোনা শুরু করেন। কিন্তু তিনি আবার ১৯১৭ সালে চারুকলা অধ্যয়ন করবার জন্য জাপানে যান। খুব শীঘ্রই তিনি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি গবেষণা সমিতির পরিচালকের পদ গ্রহণ করতে ফিরে যান চীনে। ১৯১৯ সালে তিনি ফ্রান্সে যান, যেখানে তিনি তৈলচিত্র এবং পরিলেখ অঙ্কনশৈলী (অর্থাৎ স্কেচ) বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। ফ্রান্সে থাকাকালীন তিনি সে'দেশে পরিচিত হন Ju Péon নামে। ১৯২৭ সালে চীনে ফিরে গিয়ে তিনি শাংহাই তথা পিকিঙের বিভিন্ন চারুকলা শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৩৭ সালের ১৪ই এপ্রিল, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে চীনভবনের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। শ্যু পেই-হুং রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ১৯৩৮ সালের শরতে। তিনি নিজের আঁকা কিছু ছবি নিয়ে চীনের ছুংছিং শহর থেকে রওনা হয়ে হংকং পৌঁছান। সেখান থেকে তিনি সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, পেনাং ও অন্যান্য স্থানে নিজের চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এক বছর পর অবশেষে ১৯৩৯ সালের শীতকালে তিনি পৌঁছান শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতীর চীনভবনে ধারাবাহিকভাবে কিছু বক্তৃতা দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ শ্যু পেই-হুং-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে, রেঙ্গুন ও কলকাতা হয়ে শ্যু পেই-হুং পৌঁছান শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল ১৪ই ডিসেম্বর। তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের দৈনন্দিন জীবন থেকে আহরণ করেছিলেন তাঁর চিত্রাঙ্কনের উপাদান, কবিগুরুর গভীর দার্শনিক চিন্তাভাবনা থেকে পেয়েছিলেন অনুপ্রেরণা, এবং একই সাথে তিনি শৈল্পিক সৃষ্টিতে নিমজ্জিত করেছিলেন নিজেকে।

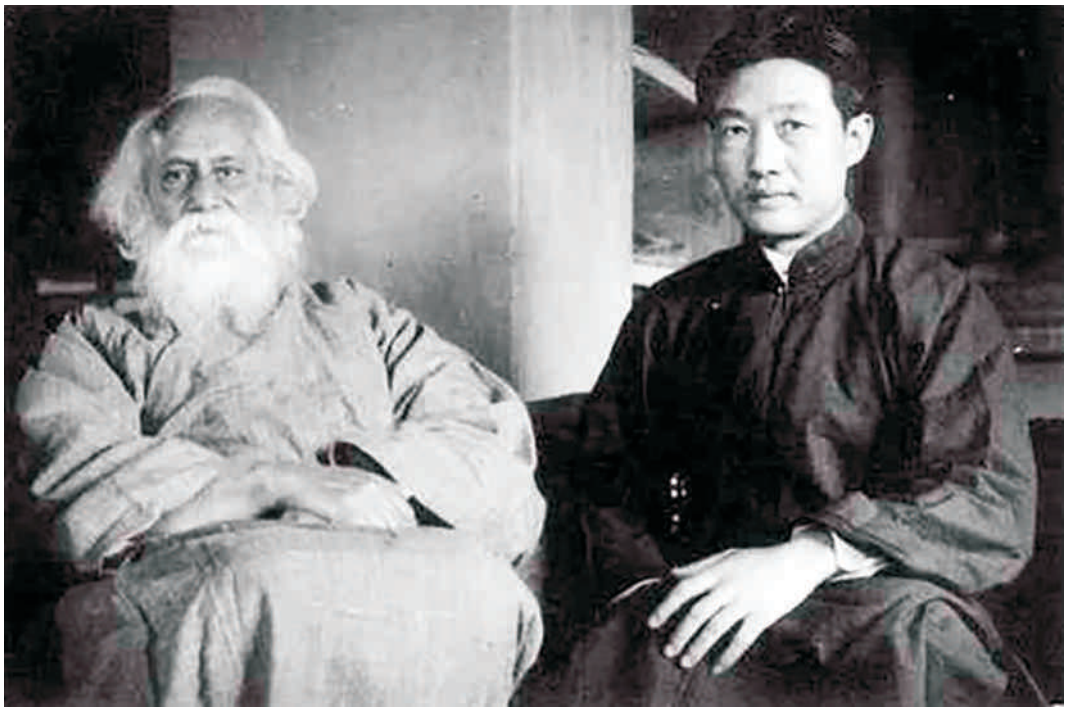

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও শ্যু পেই-হুং, ১৯৩৯

১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে, শ্যু পেই-হুং এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথের একাধিক প্রতিকৃতি। তার অন্যতম ছিল ২০শে জানুয়ারী আঁকা একটি পেন্সিল-স্কেচ — যখন কবিগুরু তাঁর পড়ার ঘরে নিমগ্ন ছিলেন সাহিত্যসৃষ্টিতে। সেই ছবিটি আয়তনে ছিল ৩৫ × ২৬ সে. মি.। কালো ফেজ টুপি পরা কবির আরেকটি ছবি আঁকা হয় ঐ একই মাসে। কবিগুরুর ইংরেজিতে সই করা একটি প্রতিকৃতি আমরা দেখতে পাই, যার নীচে শিল্পীর নাম মুদ্রাঙ্কিত আছে। সব চাইতে আকর্ষক শ্যু পেই-হুঙের আঁকা কবিগুরুর একটি রঙিন ছবি — যার অঙ্কন উপাদান ছিল রঙিন কালি আর খনিজ রং। গাছের ডালে দৃশ্যমান এক জোড়া পাখির সাথে শান্তিনিকেতনের তরুলতা-বেষ্টিত পরিবেশে কাব্যরচনায় নিমগ্ন কবির ছবিতে প্রতিফলিত হয়েছে চীন ও পাশ্চাত্যের অঙ্কনশৈলীর এক অনন্য সংমিশ্রণ।

১৯৪০ সালে শ্যু পেই-হুঙের আঁকা রবীন্দ্রনাথের বর্ণময় প্রতিকৃতি

সেই জানুয়ারী মাসেই, কলকাতার ইণ্ডিয়ান ওরিয়েন্টাল সোসাইটিতে শ্যু পেই-হুঙের চিত্রকলার দ্বিতীয় একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে তাঁর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর পরিচয় তথা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে। ১৯৪০ সালের নভেম্বরে তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কবিগুরুকে বিদায় জানান। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শ্যু পেই-হুং প্রকাশ করেছিলেন একাধিক প্রবন্ধ — ''রবীন্দ্রনাথের স্বাগত ভাষণের উত্তরে'', ''আমার বর্তমান অবস্থান ভারতে'', ''কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্মরণে'', ''ভারতের পুণ্যলোকের স্মৃতি'', ''কবির শোকে আর চিত্ররচনা প্রসঙ্গে'', ইত্যাদি। ভারতে অতিবাহিত সময়টিকে স্মরণ করে শ্যু পেই-হুং লিখে গেছেন — ''প্রেমের বাতাস বহে শ্বাসে প্রশ্বাসে, স্নান করি হেথা এই আলোকোৎকর্ষে।''

নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবির ঠিকানা শান্তিনিকেতন

এক সময় শান্তিনিকেতনে এক কবির ঠিকানায় এসে মিলেছিল সারা বিশ্ব। বেশ কয়েকটা বাড়িই নয় শুধু; বীরভূমের লাল, রুক্ষ মাটিতে রবীন্দ্রনাথ খুব আদর করে রোপণ করেছিলেন নানা গাছপালা। পাইন থেকে দারুচিনি, অঞ্জন থেকে শিমুল, আম, লিচু – কী ছিল না সেই স্বর্গীয় উদ্যানে। তাঁর এই উদ্যোগে বরাবর তাঁর পাশে ছায়ার মতো ছিলেন প্রিয় পুত্র রথীন্দ্রনাথ।

চিরকাল পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকার মানুষ ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নূতন আর অচেনাকে বরণ করে নেওয়ার কথা তাঁর রচনায়, বিশেষ করে গানে ফিরে ফিরে এসেছে। নব-পথিক হয়ে বারবার নতুন নতুন পথে যাত্রা করেছেন তিনি। এই দুটো গানের কথাই ধরা যাক। এক জায়গায় বলেছেন,

"অচেনা এই জীবন আমার / বেড়াই তারি ঘোরে।"

আর এক জায়গায় লিখেছেন,

"জীর্ণ যা-কিছু যাহা-কিছু ক্ষীণ
নবীনের মাঝে হোক তা বিলীন –
ধুয়ে যাক যত পুরনো মলিন
নব-আলোকের স্নানে।"

তাঁর সৃষ্টির বিপুল ভুবনে তাঁকে দেখা গেছে এক পথ থেকে আর এক নতুন পথে এগিয়ে যেতে। এমনই এক মহাত্মা যে চিরকাল একটিমাত্র কুটিরে আবদ্ধ হয়ে থাকবেন না সেটাই হয়ত স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তাঁর বারো বছর বয়সে। যে বাড়িতে ছিলেন তার নাম "শান্তিনিকেতন" গৃহ। ১৮৭৩ সাল। তখন রবীন্দ্রনাথের সবেমাত্র উপনয়ন হয়েছে। মাথা ন্যাড়া, গলায় উপবীত। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বদ্ধ পরিবেশ থেকে শান্তিনিকেতনের খোলা হাওয়ায় এসে একেবারে উতলা হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের মন। সেই অভিজ্ঞতার রেশ সারাজীবন বহন করেছিলেন তিনি। নিজের জীবনের কথা লিখতে গিয়ে স্মরণ করেছেন, "সেই বালক বয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকেই যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম, এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাটি দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জে শ্যামলা শান্তি, স্মৃতি-সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। তার পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন তার গভীর গাম্ভীর্য।"

১৯০১-এ এই শান্তিনিকেতনেই এক আশ্রমবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে রবীন্দ্রনাথ পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করলেন শান্তিনিকেতনে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে ছাত্রদের যুক্তির চর্চায় দীক্ষিত করা ছিল এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৯৪১ এর ২৫ জুলাই, মৃত্যুর প্রায় দুই সপ্তাহ আগে শেষবারের জন্য শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ চলে যান কলকাতায়।

১৯০১-এ রবীন্দ্রনাথের ঠিকানা ছিল এই "শান্তিনিকেতন"-গৃহই। পুরনো কলকাতার জমিদার বাড়ির ধাঁচে তৈরি "শান্তিনিকেতন"-গৃহই ছিল রবীন্দ্রনাথের পরিবারের বাসভবন, আশ্রমের অতিথিনিবাস। বলা চলে এটাই

শান্তিনিকেতনের একমাত্র বাড়ি যেখানে রবীন্দ্রনাথের বাবা, স্ত্রী, পাঁচ পুত্রকন্যাদের স্মৃতি রয়ে গিয়েছে। এই বাড়ির ছাদের এক পাশে কবিপত্নী মৃণালিনী উনুন পেতে তাঁর সংসার সাজিয়েছিলেন। তিনি রান্না করতে ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথের আবদারে নানারকম মিষ্টি তৈরি করতেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা থেকে জানা যায়, ১৯০২-এ মৃণালিনীর মৃত্যুর পর, তাঁর স্মৃতি জড়িয়ে থাকা "শান্তিনিকেতন"-গৃহে আর থাকতে পারছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। কাজেই আশ্রমের এক প্রান্তে কয়েকটা খড়ের ঘর তৈরি করে সেখানে উঠে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই ঘরগুলোর নাম হয়ে যায় "নতুন বাড়ি"। এর পাশেই "দেহলী" বলে একটি পাকাবাড়ি তৈরি করালেন রবীন্দ্রনাথ। দেহলির পর "দ্বারিক" নামের একটি বাড়িতেও রবীন্দ্রনাথ থেকেছেন।

"নতুনবাড়ি"র খড়ের ঘরগুলো দিয়েই রবীন্দ্রনাথের নিত্য নতুন বাড়ি বদলের সূত্রপাত। এই প্রবণতায় উত্তরায়ণে তিনি গড়ে তুলেছিলেন ছয়টি বাড়ি যার পাঁচটি এই সময় দেখা যায়।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের সীমানার বাইরে, পুরনো মেলার মাঠের পাশের রুক্ষ জমিতে ১৯১৯ নাগাদ খড়ের চালের যে মাটির বাড়ি করে রবীন্দ্রনাথ বসবাস করা শুরু করলেন, রাণু অধিকারীকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রথমে সেই বাড়ির নাম দিয়েছিলেন "উত্তরায়ণ"। পরে "উত্তরায়ণ" বাড়িটি পাকা হবার পর তার নাম হয় কোণার্ক। নানা উচ্চতায় এই বাড়ির ছাদগুলি নির্মিত। সামনে খোলা লাল বারান্দা। সামনে বিশাল শিমুল গাছ। এই বাড়ির বারান্দায় রবীন্দ্রনাথ নতুন রচনা পড়ে শোনাতেন, নাটক ও নৃত্যের মহড়া পরিচালনা করতেন। কাঠের বদলে এই বাড়িতে কংক্রিটের আসবাব তৈরি করিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নানা সময় যোগ করেছিলেন নতুন নতুন ঘরও।

১৯১৯-এ উত্তরায়ণ বাড়ির পাশেই, কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথের থাকার জন্য একটি বাড়ি নির্মিত হয়, যার নাম "মৃন্ময়ী"। ১৯৩৪-এ রবীন্দ্রনাথের মাটির বাড়ি "শ্যামলী" নির্মিত হবার পর মৃন্ময়ী ভেঙে ফেলা হয়। এই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ নিজে বসবাস করেননি।

খুব সম্ভবত ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন বাসভবন "উদয়ন" নির্মাণের কাজ শুরু করেন যা বহু বছর ধরে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। এটিই উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় বাড়ি। আশ্রমের পরিবেশে এই বাড়ি কিছুটা হলেও যেন বেমানান এবং উদ্ধত। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই বাড়ি নির্মাণের কাজ চলেছে, তেমন তথ্য পাওয়া যায়। "উদয়ন"-এ জাপানি দারুশিল্পী কোনো-সান এর হাতের কাজের ছোঁওয়া দেখা যায় যার মধ্যে একটি গোলাকৃতি জানলা নজর টানে। উদয়নের পাশে তৈরী হওয়া ঘরগুলি "রান্নাবাড়ি" বলে পরিচিত। এখানেও রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে কিছুদিন ছিলেন। উদয়নের পরিকল্পনা করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ ও শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। আর এক জাপানি দারুশিল্পী কিন্‌তারো কাসাহারা উদয়নের দেওয়াল মাদুর দিয়ে মুড়ে দেন। একটি জাপানি উদ্যান এবং "পম্পাসরোবর" নামের একটি জলাশয়ও তৈরি করেন। উদয়ন বাড়ি থেকেই রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১-এ শেষবারের জন্য কলকাতায় চলে যান, শান্তিনিকেতন ছেড়ে। এই বাড়ির বারান্দায় তাঁর শেষ জন্মদিনে, তাঁর উপস্থিতিতে ক্ষিতিমোহন সেন পাঠ করেন তাঁর প্রবন্ধ "সভ্যতার সংকট"। সেদিন অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ যে চেয়ারে বসে নিজের প্রবন্ধ ক্ষিতিমোহনের কণ্ঠে শুনেছিলেন, সেই চেয়ারটিও এই বাড়িতে নানা আসবাবের সঙ্গে সংরক্ষিত হয়েছে। এই বাড়ির দোতলায় রবীন্দ্রনাথের স্নানের ঘরে একটি সুদৃশ্য বাথ্‌টাব দেখা যায়। অসুস্থ অবস্থায় কবির ব্যবহৃত একটি হুইল চেয়ারও রয়েছে।

১৯১৩ নাগাদ রবীন্দ্রনাথ রামগড় পাহাড়ে একটি বাড়ি কিনেছিলেন। তিনি তার নামকরণ করেছিলেন "হৈমন্তী"। তখন কাঠগোদাম থেকে রামগড়ে তাঁর বাড়ি অবধি যেতে গেলে ১৬ মাইল দুর্গম রাস্তায় নয় যেতে হত হেঁটে, অথবা ঘোড়ার পিঠে, না হয় চারটি হাতল আটকানো "ডান্ডি" বলে এক বিশেষ চেয়ারে, যা টেনে নিয়ে যেত চারজন মানুষ। অসুস্থ অবস্থায় সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে দোতলা থেকে একতলায় উঠিয়ে-নামিয়ে আনবার জন্যই একটি "ডান্ডি" তৈরি করা হয়েছিল, যা আজও উদয়নে দেখা যায়।

১৯৩৪-এ একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখলেন, "এই আশ্রমে আমি কালে কালে নানান ঘরে বাস ক'রে এসেছি – কোথাও বেশিদিন স্থায়ী হ'তে পারিনি। এবার কোণার্কের এই কোঠা থেকেও সরে যাবার চেষ্টায় আছি। মাটির ঘর তৈরি আরম্ভ হয়েছে। মর্ত্যলোকে ঐটেই আশা করচি আমার শেষ বাসা হবে। তার পরে লোকান্তর। এই মাটির ঘরটাকেই অপরূপ ক'রে তোলবার জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা। ইঁট পাথরের অহঙ্কারকে লজ্জা দিতে হবে।"

এই মাটির বাড়ির, রবীন্দ্রনাথ নাম রাখলেন "শ্যামলী"। এই বাড়ির পুরু দেওয়ালে বাইরের উত্তাপ রোধ করার জন্য বসানো হয়েছিল ফাঁকা হাঁড়ি কলসী। এই বাড়ির ছাদ যাতে সেই সময়ের বহু মাটির বাড়ির খড়ের চালের মতো আগুনে পুড়ে নষ্ট না হয়ে যায়, তার জন্য এই বাড়ির ছাদও তৈরি হয়েছিল মাটি দিয়ে। গান্ধিজী একসময় যেমন আশ্রমে রাত কাটিয়েছিলেন "শান্তিনিকেতন"-গৃহের ছাদে খোলা আকাশের নীচে, তেমনই শ্যামলীতে এসেও সস্ত্রীক থেকেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ৭৪-তম জন্মদিনে "শ্যামলী"তে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রবেশ করেন। বেশিদিন যদিও এই বাড়িতে থাকেননি। শ্যামলীই তাঁর শেষ বাড়ি হবার কথা ছিল। কাজেই তারপরও যখন আর একটি বাড়ি নির্মাণ করলেন রবীন্দ্রনাথ, তার নাম দিলেন "পুনশ্চ"। ১৯৩৬-এর সেপ্টেম্বরে তিনি এই বাড়িতে চলে আসেন। "পুনশ্চ"র ছাদ-বিহীন খোলা বারান্দায় জানলার ধারে বসে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, এমন একটা সুন্দর ফটোগ্রাফ পাওয়া যায়। এই সময় জীবনের উপান্তে, তিনি ছবিও আঁকছিলেন। চড়া রোদের কারণে, "পুনশ্চে"র পাশেই আর একটি নতুন বাড়ি তৈরি করালেন কবি, যার নাম দিলেন "উদীচী"। এই বাড়িই রবীন্দ্রনাথের শেষ বাড়ি। প্রথমে "সেঁজুতি" ভাবলেও, পরে এর নাম রাখেন "উদীচী"। দ্বিতল এই বাড়িটির সিঁড়ি তৈরি হয়েছে বাইরে থেকে। কখনও উপরে, কখনও নীচে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতন আশ্রমে, পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনে (যেখানে সুরুল কুঠি বাড়ি এবং পাশেই জাপানি দারুশিল্পী কাসাহারা কিন্‌তারো নির্মিত এক গাছ-বাড়িতে মাঝে মাঝে বসবাস করেছেন রবীন্দ্রনাথ) রবীন্দ্রনাথের বাড়ি করার জায়গার অভাব ছিল না। কিন্তু কেন তিনি উত্তরায়ণেই স্বল্প ব্যবধানে ছয়টি বাড়ি তৈরি করালেন তা কৌতূহল জাগায়। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জাপান ভ্রমণের সময় প্রায় তিনমাস কাটিয়েছিলেন জাপানের ইয়োকোহামায় বিত্তবান রেশম ব্যবসায়ী ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক হারা সানকেই বা হারা তোমিতারোর সুবিশাল বাগান-ঘেরা বাড়িতে। হারা সান্‌কেই জাপানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঐতিহাসিক বাড়িগুলি সংগ্রহ করে তাঁর বাগানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা নিশ্চিতভাবে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। কাঠে তৈরি হওয়া জাপানের বাড়ি সহজেই খুলে ফেলে এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরিয়ে আবার পুনর্নির্মাণ করার সুযোগ ছিল। সম্ভবত সেটা লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ জাপান থেকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন মস্ত আসবাবসহ আস্ত একটা জাপানি বাড়ি। রথীন্দ্রনাথকে জাপান থেকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ করা সেই ইচ্ছে অপূর্ণই থেকে গিয়েছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অনেকগুলো বাড়িকে ঘিরে একটা বাগান গড়ে তোলা অথবা একটা বিস্তৃত বাগানে নানা ধাঁচের অনেকগুলো বাড়ি তৈরি করার ধারণা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন হারা সান্‌কেই-এর সেই উদ্যান থেকেই যা "সান্‌কেই গার্ডেন" হিসেবে আজও জনপ্রিয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত জীবন, যদি কিছু একটা খুব জোরের সঙ্গে করবার চেষ্টা করে গিয়ে থাকেন, তা সম্ভবত সুন্দর এক রুচিবোধ গড়ে তোলা। শুধুমাত্র শরীরের আরাম অথবা নিতান্ত মাথা গোঁজার তাগিদে রবীন্দ্রনাথ এতগুলি বাসভবন নির্মাণ করেননি। এর মূলে ছিল সুন্দরকে খুঁজে পাওয়ার তাঁর চিরজীবনের ইচ্ছেটুকুই। তাঁর নিত্য-নতুন বাসা বদলের কাহিনী যেন শুনিয়ে যায় এই গান :

"তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম-জন্মান্তর
সুন্দর, হে সুন্দর।"

সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়

জীবনীকারের চিন্তাধারা ও মনন – রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আমরা যখন কারুর জীবনী পড়ি, সেই জীবনীর তথ্য ও বর্ণনা আমরা বিশ্বাস ক'রে থাকি, বা বিশ্বাস করতে চাই। যাঁর জীবনী পড়ি, তাঁকে জীবনীকারের মনন দিয়ে অনেকটা চিনি।

জীবনচরিত রচয়িতার মনন নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবেদন করছি এই প্রবন্ধে। প্রসঙ্গটি হ'লো, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কোন্ মানসিকতা ও নৈপুণ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অতি গুরুত্বপূর্ণ জীবন-আখ্যান এবং সৃষ্টিকর্মের পরিচিতি রচনা করেন। অর্থাৎ, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার থেকে শুরু ক'রে প্রায় শেষ অবধি, কবির লিখিত যে-জীবনী ও রবীন্দ্রসৃষ্টির পরিচিতি, বর্ণনা ও ব্যাখ্যা রবীন্দ্রানুরাগী ও গবেষকরা আকর-গ্রন্থ হিসেবে পেয়েছেন, সেই জীবনীকারের চিন্তাধারা, চরিত্র ও যুক্তি-সংগঠনের একটি সবিনয় বিবরণ দিচ্ছি এই নিবেদনে। এই সুবাদে একটি স্বীকারোক্তি করি – এই নিবেদনে আমার উপস্থাপনার অবলম্বন ও মূলধন কেবলমাত্র একটিই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের বাংলা পরিষদ (আকাদেমি) প্রকাশিত (২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯২) একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা প্রভাতকুমারের জ্ঞানসাধনা ও গ্রন্থরচনা বিষয়ে। এই জীবনকথা লেখেন ঐতিহাসিক শ্রী নেপাল মজুমদার ১৯৯২-এ প্রভাতকুমারের জন্মশতবর্ষে। নেপাল মজুমদার প্রভাতকুমারের বিশেষ পরিচিতজন ছিলেন। আমি মূলত নেপাল মজুমদারের লেখারই বিশেষাংশের উক্তি দিয়েই আমার নিবেদন পেশ করছি। শুরুতে লিখেছি অল্প দু'কথা আমার স্বচক্ষে দেখা ও জানা প্রভাতকুমারকে নিয়ে। আমার চোখে দেখা প্রভাতকুমারের সঙ্গে "নেপাল কাকু"-র বিবরণের (যতটুকু আমার জ্ঞাত) অনেক মিল পাই। তাই নেপাল কাকুর বক্তব্য আমার কাছে গ্রহণীয়। অবশ্যই, ওঁর বক্তব্যের গভীরতা, ব্যাপ্তি এবং তা'র প্রমাণ বিদগ্ধ ও পরীক্ষিত।

আমার নিজস্ব বক্তব্য আমার পারিবারিক অভিজ্ঞতা, বড় হওয়া ও সেই জীবনযাত্রাপথে মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি ক'রে। আমার দেখা প্রভাতকুমার ছিলেন এক আমূল এবং প্রকৃত যুক্তিবাদী, লোকহিতকর, মানবাধিকার-সচেতন, স্বাধীনচিত্ত, আত্মবিশ্বাসী, বিশ্বজ্ঞান-সম্পন্ন, বিচক্ষণ, আধুনিক, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। বিশেষণের তালিকা-টি যথার্থ কারণেই লম্বা। প্রভাতকুমারের প্রজ্ঞার শুরু হয় কৈশোরে ১৯০৭-এ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সভায় অংশগ্রহণ করায় বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। সেই বহিষ্কার ছিল গৌরবের, কারণ প্রভাতকুমার সেই সভায় যাওয়ার কথা গোপন করতে পারলেও করেননি এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যখন প্রভাতকুমারকে ক্ষমা চাইতে বলেন, তখন ক্ষমা চাননি। পরিণামস্বরূপ, বহিষ্কৃত হন। একজন কিশোরের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সত্যপরায়ণতা এখানে পরিষ্কার। ব্যক্তিগত ও সাংসারিক দুঃসময়ের মধ্যে পড়েন প্রভাতকুমার। বয়সের সঙ্গে প্রভাতকুমারের চরিত্র আরো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ১৯০৯ সাল থেকে রবীন্দ্র-সান্নিধ্য প্রধান ভূমিকা নেয়। প্রভাতকুমার শিক্ষাজগৎ ও সমাজসেবায় সমানভাবে ব্রতী ছিলেন। নিজে শস্য ও মৎস্য চাষ করান। গ্রামীণ উন্নয়নে ব্রতী হন, যেমন গ্রামীণ সেচ প্রকল্পের জন্য জলাধার নির্মাণ, গ্রামে কখনো আগুন লাগলে তা'র হাত থেকে বাঁচতে জলাশয় খনন্, ভবিষ্যৎ খাদ্য-সমস্যা নিবারণের জন্য উপযুক্ত শস্য চাষ যেমন সয়াবীন (soyabean), বোলপুরের শিক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করা ও বিদ্যায়তন স্থাপন করা, যে কাজে অবশ্য তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় মুখ্য ভূমিকা নেন। প্রভাতকুমারের এই পরিচয় আংশিক। এই মানুষটি যখন রবীন্দ্রজীবনী বা রবীন্দ্রচর্চা করেছেন তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গির দিকে দৃষ্টিপাত করি।

নেপাল মজুমদার লিখেছেন (নেপাল-কাকুর লেখার সঙ্গে আমার লেখা মেশানো; ফলে, উক্তি-চিহ্ন দিইনি। তথ্য, গবেষণা, যুক্তি – নেপাল-কাকুর। ক্ষেত্রবিশেষে, আমি ওঁর বক্তব্য একই রেখে অন্যভাবে সাজিয়ে লিখেছি):- রবীন্দ্রনাথের

জীবনের প্রায় ৭২ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বাংলাভাষায় তাঁর কোনো নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়নি। সবচেয়ে লজ্জার কথা 'নোবেল প্রাইজ' পাওয়ার দীর্ঘকাল পরেও কোনো বাঙালি কিংবা ভারতীয় লেখকের নয়, এড্ওয়ার্ড্ টম্প্সনের মতো একজন ইংরেজ লেখকই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে কবির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনার কাজে অগ্রণী হলেন। Reverend Thompson বাঁকুড়া ক্রিস্চান্ কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ১৯২৬ সালে বিলেতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস হতেই – Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist – এই শিরোনামে বড় আকারে টম্প্সনের রচিত রবীন্দ্রনাথের জীবনীগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে টম্প্সন-লিখিত সংক্ষিপ্ত রবীন্দ্রজীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২১-এ।

টম্প্সনের এই গ্রন্থটি, বিশেষ করে তাঁর রচনারীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি, রবীন্দ্রনাথের আদৌ ভালো লাগেনি। কবি এক পত্রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখছেন, "এমন উদ্ধত নিঃসংশয়তার সঙ্গে তিনি আমার রচনা সম্বন্ধে রায় দিয়েছেন যেন বাংলা ভাষায় তাঁর দৃষ্টির কোন বাধা নেই। এই বইয়ে Thompson অনেক জায়গাতে খুব flippant এবং dogmatic – ভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন, যাতে তাঁর অন্তর্নিহিত ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েচে। টম্প্সন তাঁর নিজের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংস্কারের কুহেলিকা থেকে দূরে থেকে যদি লিখতেন তাহলে আমাকে ভালোই বলুন আর মন্দই বলুন, এই একটা অবজ্ঞা ও মুরুব্বিয়ানা মিশ্রিত স্বাদ ওর মধ্যে থাকতো না। একদিকে আমাদের ভাষায় তাঁর নিতান্তই অগভীর অভিজ্ঞতা এবং অন্যদিকে আমাদের দেশের সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর অবজ্ঞা – এই দু'ই এর মিশালে তাঁর বই এমন অস্পষ্ট এবং ভঙ্গী এমন উদ্ধত হয়েচে।"

এর প্রায় ৭/৮ বছর পর, ১৯৩৩-৩৬ সালে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক' নামে অবিস্মরণীয় গ্রন্থটির দুটি খণ্ড (১ম সংস্করণ) প্রকাশিত হলে, বহু-আকাঙ্ক্ষিত একটি তথ্যনির্ভর রবীন্দ্র-জীবনীর অভাব পূরণ করে। রবীন্দ্র-জীবনীকার ও রবীন্দ্র-গবেষক হিসেবেই প্রভাতকুমারের বেশি খ্যাতি ও পরিচিতি; বস্তুত এ খ্যাতি বিশ্বজোড়া খ্যাতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'রবীন্দ্রজীবনকথা', 'কবি কথা', 'শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী', 'রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী', 'রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী', 'রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ', 'রবীন্দ্রনাথের গান' (দুই খণ্ডে কালানুক্রমিক সূচী), 'গীতবিতান' (কালানুক্রমিক সূচী দুই খণ্ড), 'রবীন্দ্র জীবনপঞ্জী', 'রবীন্দ্র দিনপঞ্জী' (কালানুক্রমিক চার খণ্ড) – সর্বোপরি তাঁর চার খণ্ডে সমাপ্ত মহাভারততুল্য 'রবীন্দ্র-জীবনী' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সুবিশাল এক আকরগ্রন্থ।

১৯৩১-৩২ সাল হতেই প্রভাতকুমার রবীন্দ্ররচনা এবং রবীন্দ্র-জীবনীর তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য একটা বড় উপলক্ষ এসে পড়েছিল। ১৯৩১সালে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সারা দেশে, বিশেষ করে বাংলায়, মহাসমারোহে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের উদ্যোগ-আয়োজন চলতে থাকে। এই উপলক্ষে আচার্য জগদীশচন্দ্র, গান্ধীজি, রোমাঁ রোলাঁ, আইন্স্টাইন, কস্তিস্ পালামাস্ প্রমুখ কয়েকজনকে নিয়ে একটি বিশ্বকমিটিও গঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিশ্বের মনীষীদের প্রেরিত বাণী নিয়ে The Golden Book of Tagore নামে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ চলতে থাকে। সারা বাংলা, বিশেষ করে কলকাতা মহানগরী, এই জয়ন্তী-উৎসবের আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আসল কাজের কাজ খুব বেশি কিছু হলো না। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা ও সৃষ্টিকর্মের সংকলন প্রকাশ, তাঁর রচনা-পঞ্জী, এবং জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী, সর্বোপরি একটি নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ রচনার কাজে তেমন-কেউ এগিয়ে এলেন না। প্রভাতকুমার সেটা লক্ষ্য করে নিজেই সে-কাজে ব্রতী হবার সংকল্প করেন এবং সেই লক্ষ্যে তাঁর নীরব প্রস্তুতির কাজ চলতে থাকে। এই জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষেই ২৫শে বৈশাখ (১৩৩৮) 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' শীর্ষক তাঁর পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় প্রবাসী প্রেস হতে। প্রায় বছর খানেক পর, ১৯৩২ সালে প্রভাতকুমার রচিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী' গ্রন্থটি শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী হতেই প্রকাশিত হয়। বস্তুত, প্রভাতকুমারের এই গ্রন্থটিই সর্বপ্রথম এবং মোটামুটি নির্ভরযোগ্য রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। অবশ্য এ-কাজে তিনি প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ, পৃথ্বীসিং নাহার, অমল হোম প্রমুখ কয়েকজন কবির ঘনিষ্ঠ অনুগামীর কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। 'প্রবাসী'র

'পুস্তক-পরিচয়'-এ (মাঘ ১৩৩৯, পৃঃ ৫৫০) স্বয়ং প্রিয়রঞ্জন সেন প্রভাতকুমারের এই 'রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী' সম্পর্কে লিখলেন, "বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক প্রভাতবাবু রবীন্দ্রনাথের ১৬ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ৫৭ বৎসরের মুদ্রিত রচনার সময় ও বিবরণ এই পুস্তিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে পাঠকদের যে কত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সন তারিখের ঠিকানা সাহিত্যিকের নিকট নিতান্ত হেয় নয়, একেবারে বর্জন করিবার মত নয়, চিন্তাপ্রগতি বুঝিবার পক্ষে কালের পরিমাপ যে আমরা অবলম্বন না-করিয়া থাকিতে পারিনা; সুতরাং রবীন্দ্র-সাহিত্য-পিপাসু বাঙালী পাঠক প্রভাতবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিল।"

১৯৩৩ সালেই, প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্র-জীবনী' ও 'রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক'-শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে এই 'রবীন্দ্র-জীবনী'র দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়, শান্তিনিকেতন প্রেস হতেই। দুই খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর এই প্রথম সংস্করণের 'রবীন্দ্র-জীবনী'কে পরবর্তী কালের চার খণ্ডে সমাপ্ত বিশাল 'রবীন্দ্র-জীবনী'র খসড়াগ্রন্থ বলাই ভালো। 'রবীন্দ্র-জীবনী'র এই প্রথম সংস্করণে প্রভাতকুমার প্রধানত কালানুক্রমিক এবং তথ্যনির্ভর হতে চেয়েছেন এবং এই তথ্যকে অনুসরণ করেই কবির প্রতিভা ও ভাবমূর্তির একটি রেখাচিত্র তিনি দেশবাসীকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন। এ-দিয়ে যে রবীন্দ্রনাথের মত অভ্রংলিহ কবি ও শিল্প-প্রতিভার মহান ভাবমূর্তিটির জীবন্ত বা সঠিক প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা যায় না, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু জীবনীকার হিসেবে প্রভাতকুমারের বাস্তব সমস্যা গুলি ঠিক মত অনুসরণ না-করলেও তাঁর রচনার সীমাবদ্ধতার বা গুণাগুণের সঠিক বিচার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের মত মহান কবি ও শিল্পীর জীবনী-রচনার ক্ষেত্রে যেমন সহৃদয় বা সমগ্র শিল্পীর যন্ত্রণা এবং জীবনসংগ্রামের সকল দুঃখ-বেদনা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে অনুভব করা চাই, তেমনি মহাকালের বিরাট পরিপ্রেক্ষণীতে রেখে সমস্ত ভাবাবেগ ও সংস্কারকে নির্মমভাবে ঝেড়ে ফেলে নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনালেখ্য রচনা করা চাই, আর সেইসঙ্গে চাই একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের ব্যবধান। সে-দিক থেকে প্রভাতকুমারের সবথেকে বড় অসুবিধা ছিল, কবি স্বয়ং তখন সশরীরে বর্তমান; শুধু তাই-ই নয়, একেবারে কর্মসূত্রেও তিনি বিশ্বভারতীর সর্বপ্রধান রূপে স্বমহিমায় বিরাজমান। জীবিত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভাধর কবি ও শিল্পীর জীবনালেখ্য রচনা কিংবা প্রতিভার মহিমার সঠিক বস্তুনিষ্ঠ স্বরূপ-নির্ণয় সহজে (এবং একেবারে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে) সম্ভব নয়। তা ছাড়া তাঁর তিরোধানের পর একটা উপযুক্ত সময়ের ব্যবধান ও দূরত্বেরও প্রয়োজন হয়।

আর তা ছাড়া তথ্যের অপ্রতুলতা এবং এলোমেলো বিক্ষিপ্ত খণ্ড-খণ্ড সব ঘটনার অপসৃয়মান বা বিলুপ্তপ্রায় সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করে সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের যোগসূত্রে গেঁথে-গেঁথে সমগ্র রবীন্দ্রজীবনের একটি অখণ্ড মালা গাঁথা বা জীবনালেখ্য রচনা যে কী দুরূহ কাজ, যথার্থ গবেষকরাই তা ভালো করে জানেন। সবচেয়ে বড় অসুবিধা কবি স্বয়ংই সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। নিজের রচনাদি সম্পর্কে তিনি শুধু উদাসীনই ছিলেন না, নির্মমভাবে কাটছাঁট করে বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে বেশ-কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। তা ছাড়া কবির সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ তো দূরের কথা, বিস্তর সাময়িক ও সাহিত্য পত্রে তাঁর লেখার সংগ্রহ বা তার একটা নির্ভরযোগ্য তালিকাও ছিলনা বহুকাল পর্যন্ত। কবির প্রথম পর্বের বেশ-কিছু রচনা, যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার বেশ-কয়েকটিই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

এখন শান্তিনিকেতন 'রবীন্দ্রভবন'-এ রবীন্দ্র-তথ্যাদির যে-সুবিশাল বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ এবং সেই তথ্যাদি আধুনিক সুশৃংখল প্রণালীবদ্ধভাবে তালিকাভুক্ত করা আছে, এ-সব তখন চিন্তাও করা যেত না। এই পর্বতপ্রমাণ রবীন্দ্র-তথ্য সম্পদ জোড়াসাঁকোর কয়েকটি বাড়িতে এবং পরবর্তীকালে 'উদয়ন' এবং 'উত্তরায়ণ'-এর কয়েকটি বাড়িতে প্রায় গুদামজাত করে রাখা হয়েছিল। তখনকার এই বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতিটা স্মরণ রাখলে বুঝতে পারা যাবে, রবীন্দ্র-গবেষণা-চর্চা, বিশেষ করে পথিকৃৎ হিসেবে রবীন্দ্র-জীবনী রচনার কাজটা প্রভাতকুমারের পক্ষে সেদিন কতখানি দুরূহ ছিল। প্রভাতকুমারের অবদান এবং কৃতিত্ব কতখানি তারও একটা ধারণা পাওয়া যাবে এর থেকে।

কবি ও শিল্পীর যথার্থ স্বরূপ বা পরিচয় কী, কবি-জীবনীই বা কী দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হওয়া উচিত, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে এবং কয়েকটি রচনায় ও কবিতায় মাঝে মাঝে উল্লেখ করেছেন। যথা, "বাহির হইতে দেখো না এমন করে, / . . . কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে"। তবে সেটা প্রধানত আত্মকাহিনী বা আত্মজীবনী প্রসঙ্গেই কবি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু জীবনীকারের দায়িত্ব যে অনেক; শুধু আশু বা বর্তমান প্রজন্মের জন্যই নয়, ইতিহাস ও ভাবীকালের প্রয়োজনেও অনেক দায়-দায়িত্ব এবং সতর্কতার, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মতো মহান কবি ও শিল্পী এবং মনীষীর জীবনী রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। প্রভাতকুমার সেই দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং তাঁর সাধ্যমতো তা পালনের চেষ্টা করেছেন।

প্রভাতকুমার রচিত জীবনীগ্রন্থ সম্পর্কে কবির যেটা প্রধান প্রশ্ন ও সংশয় ছিল সেটা তিনি প্রভাতকুমারকেও বলেছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশের কেন তিনি এত বিস্তারিত পরিচয় বা বিবরণ দিতে গেলেন, আর সেটা মূল গ্রন্থে না-দিয়ে পরিশিষ্টে দিলেই ভালো হত। কৈফিয়ৎ বা আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রভাতকুমারেরও বক্তব্য আছে। সেটা তিনি দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় শুরুতেই লিখেছেন: "কিন্তু বস্তুবিচারী ঐতিহাসিকদের নিকট কবির বহুমুখী প্রতিভার অভিব্যক্তির জন্য তাঁহার পূর্বপুরুষদের দোষ ও গুণ সমভাবে দায়ী। প্রতিভার সহিত প্রাকৃতের পার্থক্য যতই গভীর বলিয়া প্রতিভাত হউক গঙ্গোত্রীর সহিত গঙ্গাসাগরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্যভাবেই যুক্ত। সেই জন্যই আমরা রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণের কাহিনী-পর্বটি অবান্তর জ্ঞানে পরিত্যাগ বা পরিশিষ্টে সংযোজন করিতে পারিলাম না, গঙ্গোত্রী হইতেই আমরা যাত্রা শুরু করিলাম। রবীন্দ্রনাথ যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই ঠাকুরপরিবারের সহিত গত একশত বৎসরের বাংলা সাংস্কৃতিক ইতিহাস এমনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার যথার্থ উৎস আবিষ্কার করিতে হইলে সেই বংশের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।"

সম্পূর্ণ না হলেও, মোটামুটি একটা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রভাতকুমার চার খণ্ডে রচিত তাঁর এই বিশাল জীবনীগ্রন্থে একেবারে সূচনাকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত রবীন্দ্র-জীবনের বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণ না-বলে এক হিসেবে একে ইতিহাস বলাই শ্রেয়। কেননা এতে তো শুধু রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সারা জীবনের শিল্প-সাহিত্য ও সৃষ্টিকর্মেরই নয়, সেই সঙ্গে প্রায় এক শতাব্দীকাল বাংলার তথা ভারতের ধর্ম, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার, দেশের আর্থ-সামাজিক এবং জাতীয় ও বিশ্বরাজনীতি বা আন্তর্জাতিক আন্দোলন – শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাসও সেই সঙ্গে এতে বর্ণিত হয়েছে। একান্তভাবে এ-গ্রন্থ কবি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ কিংবা তাঁর শিল্প-সাহিত্য ও যাবতীয় সৃষ্টিকর্মের নিছক কালানুক্রমিক বিবরণ মাত্র নয়। কী বাস্তব আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবি ও শিল্প-প্রতিভার স্ফুরণ বা উন্মেষ এবং বিকাশ ঘটেছে, কত অসংখ্য বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং সংঘর্ষের মধ্যে পর্যায়ে পর্যায়ে কবিমানসের অগ্রগতি এবং বিকাশ ঘটেছে, এই মহাগ্রন্থে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ দেশ-মানব তথা বিশ্ব-মানব। জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় এবং সমস্ত রকমের কুসংস্কারের বেড়া ভেঙে বিশ্বের এক চরম সংকটকালে তিনি যেভাবে বিশ্ব মানবিকতা এবং আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে সর্বোচ্চে তুলে ধরেছিলেন, সে-মুহূর্তে তা যে খুবই দুর্লভ এবং বিস্ময়কর ছিল, প্রভাতকুমার সেটাই বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাই বলে 'ভক্তে'র দৃষ্টিতে মন্ত্রমুগ্ধ বা মোহাবিষ্টের মতো তিনি 'রবীন্দ্র-পূজা' বা রবীন্দ্রনাথকে প্রায়-অবতার বানাতে চেষ্টা করেননি। রবীন্দ্রজীবন পরিক্রমা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি, অনেক অসঙ্গতি ও স্ববিরোধী প্রবণতা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঠিক সময়মতো অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি তার সমালোচনা করতেও দ্বিধা করেননি। এখানে খুব সংক্ষেপে তার দু'টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। যেমন, কবির কয়েকটি বিদেশ সফর সম্পর্কে কিছু মন্তব্য ও সমালোচনাও করেছেন। বিশেষ করে, ১৯২৬ সালে মুসোলিনীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ইতালি ভ্রমণে যাওয়া

সম্পর্কে। অন্য এক প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রজীবনীকার রবীন্দ্রনাথকে সশ্রদ্ধচিত্তে বিশ্লেষণ করেছেন কবির মনোভাবের বিবর্তন নিয়ে – হিন্দু সংস্কার, হিন্দু সামাজিক আচার, আদি ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল প্রথা থেকে কবির ক্রমশ উন্মোচন সম্বন্ধে।

চার খণ্ডের সমগ্র এই মহাগ্রন্থটিতে আছে কবি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, মনীষী ও চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক প্রতিভার মহত্ত্বকে বোঝবার এবং তুলে ধরবার অদম্য সাধনা ও প্রয়াস। সুদূরপ্রসারী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থের লক্ষ্যে কোন কোন জায়গায় কবির সাফল্য ও সার্থকতা, জীবনীকার হিসেবে তিনি তাও নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি কবির অসাফল্য ও ব্যর্থতার বেদনা কোথায় – মানসিক যন্ত্রণার কাঁটাগুলি কোথায় শেষ জীবনে তাঁকে অনুক্ষণ বিদ্ধ করেছে, তাও তিনি নির্দেশ করেছেন।

শেষ জীবনে কবির প্রধান বেদনা ও যন্ত্রণাটা ছিল, শান্তিনিকেতনের তথা বিশ্বভারতীর শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য। জীবনীকার সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যে শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাবিধির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তখনকার নানা বাস্তব বাধা প্রতিকূলতার জন্য বারবার কবিকে আপোস-রফা করতে হয়েছে সেই বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের দিকে আলোকপাত করেছেন রবীন্দ্রজীবনীকার। পরাধীন ভারতে প্রচলিত শিক্ষাবিধির বিরুদ্ধে কবির সবচেয়ে বেশি আপত্তি ছিল, পরীক্ষা-পাস ও ডিগ্রি লাভের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের শিক্ষার সূচনায় তিনি পরীক্ষা-পাস একেবারে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্মম বাস্তব পরিস্থিতি তাঁকে বাধ্য করেছিল পরীক্ষা-পাস ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আপস করতে (রবীন্দ্রজীবনী চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১)। প্রভাতকুমার লিখেছেন, "... কবি বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাঁহার বিদ্যালয় শিক্ষার নানা স্তরে 'রক্ত-পিপাসু পরীক্ষাদানবের কাছে শিশুদের বলি' দিবার আয়োজন হইয়াছে। তিনি অনুভব করিতেছেন যে, যে আদর্শ হইতে বিদ্যালয়ের উদ্ভব তাহা হইতে এখন উহা অনেক সরিয়া আসিয়াছে।"

প্রভাতকুমারের শেষ জীবনের আরও দুটি প্রধান রবীন্দ্র-গবেষণা ও সাহিত্যকৃতির নিদর্শন হলো 'গীতবিতান'-এর কালানুক্রমিক সূচী (২ খণ্ডে)। অপরটি হলো 'রবীন্দ্রদিনপঞ্জী' (চার খণ্ড – অসম্পূর্ণ)। 'গীতবিতান'-এর সংকলনের সূচনাকালে গানগুলির কালানুক্রমিক বা তার কাল ও সূত্র-নির্দেশ ইত্যাদি কিছু ছিল না; তা ছাড়া বিষয়ভিত্তিক-বিবেচনার দিক থেকেও তা মোটেই সুবিবেচিত বা সুনির্বাচিত হয়নি। স্বয়ং কবির-ও তা ঠিক মনঃপুত হয়নি। 'গীতবিতান'-এর প্রথম সংস্করণ (৩ খণ্ড) ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত হয়। তার মোট গানের সংখ্যা ছিল ১৪৮৫। সংকলন ও সম্পাদনা কবির মোটেই পছন্দ হয়নি। ঢেলে নতুন করে তা পুনর্বিন্যাস করে রেখে যাবার আর অবকাশ হয়নি তাঁর।

কবির মৃত্যুর পর প্রভাতকুমার তাঁর রবীন্দ্র-জীবনী এবং রচনাপঞ্জীর 'কার্ড-ইন্ডেক্স' প্রথায় কাজ করে চলেছিলেন; তখনই তাঁর কালানুক্রমিকভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সূচী প্রণয়নের কথাটা মাথায় আসে। প্রভাতকুমার লিখেছেন, " ... আমরা রবীন্দ্রনাথের গানকে কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়েছি। আমরা মনে করি, যে-গান যে-বয়সে রচিত হয়েছিল তখনই তা সার্থকরূপ পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যে-বয়সে যে-গান লিখেছিলেন, আমরা সেই বয়সের দৃষ্টিতেই গানগুলির গুণাগুণ বিচার করবো।" প্রভাতকুমার মনে করেছিলেন কবির বয়স ও পারিপার্শ্বিকতার সম্বন্ধ ছিল তাঁর সঙ্গীতসৃষ্টিতে। সেই বিবর্তন কালানুক্রমিকভাবে অনুভব করার ও জানার সার্থকতা আছে।

প্রভাতকুমার এবং তাঁর সহধর্মিণী সুধাময়ী দেবীর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের ইংরেজি অনুবাদে। ১৯৮১ সালে সুধাময়ী দেবীর ৫০ টি গানের ইংরেজি তর্জমা প্রকাশিত হয়। সুধাময়ী মোট ১০২টি গান অনূদিত করেন আনুমানিক ১৯৬২ সাল থেকে শুরু ক'রে। সুধাময়ী দেবী লিখেছেন, "১৯৬৪ সনে (১৩৭১ বঙ্গাব্দে) আষাঢ় মাস থেকে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে আমার সঙ্কলিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরেজী অনুবাদ-সূচী ধারাবাহিকভাবে, সাত আট মাস। তারপর এই প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় অসম্পূর্ণ অবস্থায়।"

রবীন্দ্রনাথের মতো এক বহুমুখী এবং গগনচুম্বী বিশ্বপ্রতিভার সম্মোহনকারী ব্যক্তিত্বের প্রভাব কাটিয়ে যথার্থ এক নিরপেক্ষ জীবনীকারের মোহমুক্ত দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রজীবনের এক বস্তুনিষ্ঠ এবং তথ্যনিষ্ঠ সুদীর্ঘ পরিক্রমণ এবং মূল্যায়নে সমর্থ এবং সাফল্য লাভ করলেন, এটা সত্যিই আমাদের পরম গৌরবের কথা। তাঁর এই বিরাট ও বিপুল শ্রমসাধ্য কাজের এখন কিছু ত্রুটি, কিছু ভুল-ভ্রান্তি অর্বাচীন-কালের গবেষকদের কাছে ধরা পড়তে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট বিশ্বমানবের জীবনী ও তথ্যাদি সংযোজনের এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যুগে যুগে তাই ঘটবে এবং সেটাই স্বাভাবিক। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নানা বাধা ও অসুবিধার মধ্যে থেকেও প্রভাতকুমার রবীন্দ্রজীবন-কে যে মহাগ্রন্থর মধ্যে দিয়ে আমাদের চিনিয়ে দিয়ে গেলেন, আমরা তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

(স্বীকারোক্তি: এই প্রবন্ধে বাংলাভাষার লেখ্য-রূপ, বিধিলিপি ও বিন্যাসে অসংগতির কারণ হ'লো এই, যে আমি বিভিন্ন উক্তি ব্যবহার করেছি এবং আমার নিজের বাংলা লেখার অনুরক্তি ও পছন্দ অনুযায়ী-ও লিখেছি। – "অভ্র" বাংলা-লিপি-কে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। তবু বলি, যে কম্প্যুটারে Windows-এর নানা মামাতো, পিসতুতো সংস্করণের সঙ্গে সংগতি রেখে "অভ্র"-এ লেখা বেশ পিচ্ছিল-ভূমি। ত্রুটি চোখে পড়লে, মার্জনা করবেন। – পরিশেষে আমার গিন্নি শ্রীমতি পৃথা মুখোপাধ্যায়-কে কৃতজ্ঞতা জানাই; ওঁর সাহায্য পেয়ে আমার ত্রুটি-র পাহাড় কিছুটা মাথানত করেছে, আশাকরি।)

শমীন্দ্র ভৌমিক

আবার ফিরে এলে

আবার যদি ফের আমি
আবার ফিরে আসি এসে
আবারো এই দেশের হতে
চাইবো অধিবাসী এবং
চাইবো ভোরের আলোয় আমার
না দ্যাখা গ্রামটাকে দেখে
ছোট্ট নদীর তীরে আমি
ছুটবো আঁকে বাকে ।

আবার ফিরে এলে আমি
দেখতে যেন পাই আমার
যেমন ছিলো তেমন যেন
ছোটোই থাকে ভাই আমার
মায়ের হাতের ছোঁয়ায় আমার
ভাত দুপুরের পাতে পুঁটি
মৌরালা চচ্চড়ি এবং
আধখানা ডিম রাতে সেই
রাতের মুগ্ধতায় আমি
সুর ছড়িয়ে গাই আমি
আবার ফিরে এলে আমার
রবীন্দ্রনাথ চাই ।

তপনজ্যোতি মিত্র

কবির গান

কি করে এত সুন্দর গান বাঁধেন কবি ? কারা যেন বলছিল, গাইছিল ।
হৃদয়ের কোন গভীরতম আবেগ থেকে আসে এইসব আকুল করা গান ?

কবির লেখার টেবিলে পড়ে আছে একটুকরো আলো, থির থির করে কাঁপছে, সেই আলোটুকুই ত সম্বল ।
ভুবনডাঙার কবির আর কিছুই যে নেই এই একটুকরো আলোকজ্যোৎস্না ছাড়া !

সেই আলোতে কি জেগে থাকে অরণ্যের মর্মরধ্বনি ? মরুভূমির দিগন্তজোড়া হাহাকার ? আর কোনও নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের গাঢ়তম বেদনা ?
কখনো কি সেই গান শুনে থমকে দাঁড়ায় পথিক ?
হিমেল রাতের মাঠের ওপরে চুপ করে ঝুঁকে থাকে চাঁদ ?
তার একটুকরো আলো থেকে যে কখন ঝরে পড়েছে অনন্ত অশ্রুকণা,
কখন সেই অশ্রুর গহন থেকে উঠে আসে গানের আনন্দতম, বিষণ্নতম, প্রিয়তম সুরধ্বনি !

নদীর জলে ভেসে যাচ্ছিল নৌকো,
হাওয়ায় ঝরে পড়ছিল পাতা, কোথায় খসে পড়ছিল একটি দুটি তারা,
পাহাড়ের নীরব পথ পেরিয়ে কে যেন হেঁটে যাচ্ছিল ।

কবির গান বাঁধা থাকছিল আনন্দে অশ্রুতে, ভালোবাসা বেদনায় ।

পল্লববরন পাল

পঁচিশে বৈশাখ মঞ্চে

তোমার মতোই সফেদ ঝর্ণাঢেউয়ের সপাট মেঘ চিকুর
পিঠে দু'হাতের অন্তর্গ্রথিত স্থায়ী মালা,
শরীরটা ঈষৎ সামনের দিকে ঝুঁকে
সুবিনীত ছ'টা-বাজতে-পাঁচ ভঙ্গিতে
নিখুঁত ধীর শিষ্ট পায়ে হেঁটে স্টেজে উঠলেন
অবিকল আমাদের রবীন্দ্র ঠাকুর

অরিজিনাল নন, ইনি এযুগের তুমি
চকরাবকরা জামা ও নীল জিন্স,
কাঁধে শান্তিনিকেতন, আঙুলে নীলসাদা পাথর
পুষ্পসম্বর্ধনা শেষে পুরোপুরি ছ'টা হয়ে দাঁড়ালেন
ঠোঁটের ঈষৎ-ফাঁক থেকে এরপর
রবীন্দ্রনাথ কী ও কেন
বনফুল থেকে শেষ লেখা
জল পড়ে পাতা নড়ে থেকে
কে তুমি ? মেলেনি উত্তর
শেলি-কীটস থেকে গান্ধিজীর অনশন
আন্না তড়খড় থেকে বৌঠান হয়ে নোবেলচুরি
একশোবাষট্টি রকম কবিগুরু বিশ্বকবি গুরুদেব

নাইটহুড ত্যাগের বিষয়টা মনে আসতেই
জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেলো আমাদের রবীন্দ্র ঠাকুরের
দৈনন্দিন মুহুর্মুহু জালিয়ানওয়ালাবাগ সময়ে
এই পঁচিশে বৈশাখ মঞ্চের সভাপতিত্ব তো
রাষ্ট্রের দেওয়া পদ-সম্মানের জোরেই
তাই ছ'টা থেকে ফের ছ'টা পাঁচ হয়ে
মাথা ঝুঁকিয়ে ধীরপায়ে নেমে গেলেন মঞ্চ থেকে

গৌতম দত্ত

তুমিই ভরসা দু:খে সুখে

পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণ
মাঝখানে গ্রীষ্মের দাবানলে ঘুমায় তোমার শালবন
কোনো এক শিশুর কান্নায় ভাঙে শহরের মন
মা তার হাতে তুলে দেয় বড় স্ক্রিন সেলফোন
ঘুমভাঙা মা কণ্ঠে সুর নিজের মত নিচ্ছে সেধে
– 'আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে'
বীরভূমের ওই লালমাটিতে বাউল হাঁটে তপ্ত ভোরে
তার সুরেতে তাল মেলায় কোপাই নদী জলের তোড়ে
হাজার শহর লক্ষ গ্রাম একটা পঁচিশ একটা বাইশ
বদলে গেছে জগত আজ কার কাছে আর করব নালিশ
তোমার হাজার গানের কলি এখনো বাজে বাংলা বুকে
ঝঞ্ঝা ঝড় ভয়ের দিনে তুমিই ভরসা দুই বাংলার দু:খে সুখে।

পৃথা ব্যানার্জী

বাইশে শ্রাবণ

তোমাকে যত্ন করে রেখেছি বইয়ের তাকে,
রোজ যে নিয়ে বসা হয় খুব একটা – তা নয় ।
তবে হাত বাড়ালেই যে পাবো, এটাই শান্তি ।

সেদিন আকাশ ভেঙে খুব বৃষ্টি হল জানো,
আর আমার খুব বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হোল।
কিন্তু ফিরব বললেই কি ফেরা যায় ?
তাই ফিরেছিলাম তোমার কাছে।
ভেবেছিলাম – "তোমায় কেন দিই নি আমার সকল শূন্য করে"
সঞ্চয়িতায়ে মাথা রেখে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি
টেরই পাইনি ।

তোমার যে গানগুলো আমার প্রিয়
সেগুলো গুছিয়ে রেখেছি এমনভাবে
যাতে চাইলেই ইউটিউব বাজিয়ে দেয় – এক এক করে ।
এইতো সেদিন অফিসের ডেডলাইন – এর চাপে
রাতজাগা দুচোখ যখন খুঁজছিল শান্তির আশ্রয়
গভীর রাতে আমার ব্যাল্কনি ভাসিয়ে বাজছিল –
"জীবন মরনের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে"

এই যে তোমার কাছে ফিরে ফিরে আসা
দুঃখে, বিষাদে, পাওয়া, না-পাওয়ায়
আমি অনেক খুঁজে দেখেছি, আর এমন একজনও নেই,
যে হৃদয় কে ছুঁয়েছে ঠিক তোমার মত করে ।
আজ এই দূরদেশেও, তাই কালো মেঘ থমকে আছে গাছের পাতায়।
বৃষ্টি পড়ছে একনাগাড়ে।
অনেকটা মনখারাপ আঁকড়ে ধরেছে বারান্দার রেলিঙটাকে।
ওরা কিভাবে জানলো বলতো – আজ বাইশে শ্রাবণ ।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

আপনাকে প্রণাম করিনি কোনোদিন

আমি কোনোদিন প্রণাম করিনি আপনাকে।
“ভালো করে না চিনে কাউকে
প্রণাম কোরোনা কখনও”,
শম্ভু মিত্র বলেছিলেন শ্রীজাতকে।
আমি তো চিনিইনা আজও আপনাকে তেমন।
সিলেবাসে আপনার কতকগুলো পদ্য পড়েছি,
কয়েকটা ছোট গল্প,
অফিসের পিকনিকে বোলপুর গিয়েছি একবার।
একে কি চেনা বলে ?
লাল প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে পাড়ার ফাংশনে
পুঁটুর গলায় “এই লভিনু সঙ্গ তব” শোনা
কি আপনাকে জানা ?
কোথায় আপনার সঙ্গ লভিনু আমি, কোনকালে ?
স্কুলে বাংলা পড়াতেন শ্যামলী দিদিমণি।
ক্যান্সারে মারা যাবেন শুনে
দেখা করতে চেয়েছিলাম।
বললেন, “হবে না।
তাঁকে পড়ছি, চিনছি,
আর তো বেশী সময় নেই রে!”
আমি তো শ্যামলী দিদিমণি হতে পারিনি রবীন্দ্রনাথ,
আমার মা-ও নয়
যে তীব্র হাঁফানি ভুলতে গেয়ে উঠত আপনার গান।
আমি তো সিলেবাসে পড়েছি
আপনার গল্প, কবিতা,
চিনিনি তো,
জানিনি তো কিছু।
তাই অচেনা আপনাকে প্রণাম করিনি কোনোদিন।
শম্ভু মিত্র বলেছিলেন যে শ্রীজাতকে !

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ, শিশুমন ও তিনটি পোকা

এপ্রিল মাসের এক ভোর। পাঁচটা বাজে প্রায়। ঘুমচোখে হাতঘড়িতে তাকিয়ে তাই যেন দেখলাম মনে হল। সকালের মৃদু আলো ফুটেছে আকাশের গায়ে। কড়া চা এর লিকারে দুধ পড়ার মতো রং তাই বাইরে। জোর একটা আওয়াজে ঘুমটা চড়াক করে গেল ভেঙে। ভারী কাঠের টুকরো দিয়ে দেওয়ালে বাড়ী মারার শব্দ। আমেরিকার উইসকনসিনের লেক জেনিভা সংলগ্ন বনের ভিতর একটি ডর্ম হল ঘটনাস্থল। আগের দিন দুপুরবেলা প্রায় ষাট জন দশ থেকে বারো বছর বয়সী ছাত্রছাত্রী নিয়ে আমরা চারজন শিক্ষক শিক্ষিকা সেখানে পৌঁছেছি। উদ্দেশ্য শহুরে ছেলেমেয়েদের প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে কয়েকদিন কাটানোর অভিজ্ঞতার সুযোগ দেওয়া। ডর্মের নিচের তলায় একটি ঘরে আমি। বাকী তিনটি ঘরে প্রায় জনা চোদ্দ ছেলেমেয়ে। আওয়াজ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। শব্দটা পাশের ঘর থেকে আসছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে এক মুহূর্ত লাগলো। চারপাশে খোলা মাঠ আর বড় বড় গাছপালা। ডর্মের বাড়ীটি পুরনো। মূল দরজাতেও তালা চাবির ব্যবস্থা নেই। তাই যেকেউ যেকোন সময়েই ঢুকে পড়তে পারে। বিছানা থেকে নেমে এক দৌড়ে পাশের ঘরে গেলাম। অতি মামুলী আসবাব। ঘরের দুইদিকের দেওয়ালে একজোড়া করে বাংক বেড। Adam, Renzo, Gabe আর Max – মোট চারজনের স্থিতি আপাততঃ সেই ঘরটিতে। দেখলাম Adam দেওয়ালের একটা দিকের উপরের খাটের কাঠের রেলটি খুলে বিপরীত দেওয়ালের খাট পর্যন্ত পাটাতনের মতো বিছিয়ে সেতু বাঁধার চেষ্টা করছে। আর তাতেই বসন্ত ভোরের মোলায়েম নিস্তব্ধতা ভেদ করে অমন ঘটাং ঘটাং শব্দ উঠছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই ভালমানুষের মতো মুখ করে তারা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলো। ভাবখানা এমন যেন কেউই কিছু জানে না। আমি ঘুমচোখে শিক্ষিকাসুলভ গাম্ভীর্য গলায় এনে প্রশ্ন করলাম,

What is going on ?

I did not do it. He did.

What ? It was your idea, not mine.

Well, I was asleep. He woke me up.

চেনা গল্প। কে যে কার ঘুম ভাঙিয়েছে আর কার মাথায় এই সেতুবন্ধনের অভিনব ভাবনাটি এসেছে সে মীমাংসা করতে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। আমি শুধু, "Put the rail back in place and try to find something to do more quietly" এই বলে চলে এলাম নিজের ঘরে। ঘুম মাথায় উঠলো। ভাবলাম এই হল শিশুমনের সুস্থ স্বাভাবিক কল্পনা। বটেই তো! ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেছে বেচারীর। বাড়ীর বাইরে অজানা পরিবেশে রাত্রিবাস। সঙ্গে আইপ্যাড, ল্যাপটপ, আইফোন ইত্যাদি কিছুই নেই। টিভি দেখার উপায় নেই ডর্মে। অতএব খাটের রেল খুলে সেতু বানান ছাড়া করার আছেটাই বা কি ?

কল্পনায় সে তখন পার হয়ে যায় সেতু, নগর, অরণ্য, বন্দর। তার পা এর নিচে ফুঁসছে উত্তাল জলরাশি। মাথার উপর রাগী মেঘ। কোথাও তার হারিয়ে যেতে মানা নেই। দেশ কাল নির্বিশেষে শিশুমনের এই কল্পনার জগতের কথাটি রবীন্দ্রনাথ খুব ভালভাবে বুঝতেন। তাই তাঁর বালক বীরপুরুষ রাঙা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয় খোলা তরোয়াল হাতে। মাকে বাঁচাতে কিই না করে সে ! ছোটদের এই খেয়ালখুশির আনন্দময় পৃথিবীর সঙ্গে বড়দের যুক্তিময় জগতের অমিল সর্বদাই। তাই স্বাভাবিক কারণেই বড়দের প্রতি আস্থাহীন তারা। নিজের ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

লিখেছেন, "সব তাতে মানা করাটাই বড়দের ধর্ম। কিন্তু একবার কি কারণে তাঁদের মন নরম হয়েছিল, হুকুম বেরোল ছেলেরাও যাত্রা শুনতে পাবে। ছিল নল-দময়ন্তীর পালা। আরম্ভ হবার আগে রাত এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় ছিলুম ঘুমিয়ে। বার বার ভরসা দেওয়া হল সময় হলেই আমাদের জাগিয়ে দেবে। উপওয়ালাদের দস্তুর জানি। কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, কেননা তাঁরা বড় আমরা ছোট।" আর ছোটদের মনোজগৎ সম্বন্ধে তাঁর এই সচেতনতা প্রতিফলিত হয় তাঁর শিশুসাহিত্যে ও তাঁর সৃষ্ট শিশু-কিশোর চরিত্রগুলিতে।

ছোটদের প্রতি তাঁর যেন কিছু প্রশ্রয়ের ভাব ছিল। বিশ্বকবি হয়েও তিনি শিশু ও কিশোর সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। শিশুসাহিত্য ছাড়াও অন্যান্য অনেক গল্প, নাটক বা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের শিশুচরিত্র পাঠকমনে গভীরভাবে দাগ কাটে। 'অমল ও দইওয়ালা'র অমল, 'অতিথি'র তারাপদ, 'অচলায়তন' এর দামাল ছেলের দঙ্গল বা 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় দুরন্ত বোনপো প্রাণপ্রাচুর্য্যে, কৌতুহলে আর সারল্যে বড় জীবন্ত। মানুষের শৈশবকালের মনের খবরাখবর গভীরভাবে জানা থাকলে তবেই সম্ভব এমন চরিত্রচিত্রণ। 'কাল ছিল ডাল খালি আজ ফুলে যায় ভরে / বল দেখি তুই মালী, হয় সে কেমন করে ?' সহজপাঠের পাতায় পাতায় রেখায় আর অক্ষরে ছেলেমানুষের এই অপার বিস্ময়। একটি সহজ প্রাকৃতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমন প্রশ্ন শুধু শৈশব অনুত্তীর্ণ ছেলেপুলেরাই করতে পারে। এই বিস্ময়ের বোধও শিশুমনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিস্মিত হতে পারার ক্ষমতাও হারিয়ে যায় অনেক সময়। আর তখনি মন জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিশ্বকবির মন থেকে এই শিশুসুলভ বিস্ময় হারিয়ে যায় নি পরিণত বয়সেও।

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে লিখতে বসেছিলাম। এই পর্যন্ত লেখার পরেই কানে এল, "Jita, do you think worms are good source of animal protein ?"

"Why do you ask Gabe ?"

Gabe ওরফে Gabriel উত্তর দিল, "I ate three worms ."

মনে মনে আঁতকে উঠলেও যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "When ? Where ?"

"Just now. From the ground ."

"Did you really eat live worms ?"

"yes"

"Are you sure you are ok ?"

দার্শনিক সুলভ উদাসীনতায় সে জবাব দিল, "People eat worms all the time."

আমার পরিণত মন Gabe এর এই উত্তরে কুঁকড়ে উঠলে কি হবে কিশোর Gabriel এর মনে জ্যান্ত পোকা ধরে খাওয়ার পরিণতি সম্ভাবনায় ভরপুর। আসলে বাল্যে ও কৈশোরে আমাদের মন নির্দিষ্ট কোন পরিণতির সম্ভবনায় বাঁধা পড়তে চায় না। ভুবনডাঙার খোলা মাঠের মতোই আদিগন্ত প্রসারিত স্বপ্ন, ইচ্ছা আর আশা তখন। কবিগুরু সব দেশের সব কালের শিশুদের অপরিসীম, অদ্ভুত সব স্বপ্ন আর কল্পনাবিলাসের কথাটি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর লেখায় (কবিতা – জন্মদিনে)পাই,

"বয়স আমার বুঝি হয়তো তখন হবে বারো,
অথবা কী জানি হবে দুয়েক বছর বেশি আরো।
পুরাতন নীলকুঠি-দোতালার 'পর
ছিল মোর ঘর।

সামনে উধাও ছাত –
দিন আর রাত
আলো আর অন্ধকারে
সাথিহীন বালকের ভাবনারে
এলোমেলো জাগাইয়া যেত,
অর্থশূন্য প্রাণ তারা পেত,
যেমন সমুখে নীচে
আলো পেয়ে বাড়িয়া উঠিছে
বেতগাছ ঝোপঝাড়ে
পুকুরের পাড়ে
সবুজের আল্পনায় রঙ দিয়ে লেপে।"

সাথীহীন বালকের এলোমেলো সব ভাবনা তিনি অর্থহীন বলে উড়িয়ে দেন নি। বরং নিজের অন্তর দিয়ে তাদের অবাধ খেয়ালখুশির জগৎটি অনুভব করতেন তিনি। তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বাস করত এক চিরশিশু। কল্পনার রঙে নিয়তই যে এঁকে চলে নানাবিধ ছবি। তার ফলস্বরূপ আমাদের প্রাপ্তি গভীর জীবনমুখী এক সাহিত্যসম্ভার।

মানস ঘোষ

সিলেবাসের বাইরে

আমাদের দেশ নাকি বীরপূজার দেশ। ভক্তিরসে টইটুম্বুর। যাকে ভালো লাগে তাঁর সম্পর্কে বিতর্কিত কিছুই শুনতে আমাদের মন চায়না। এই যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, – তাঁকে আমরা, আপামর বাঙালি, কখনো রবি ঠাকুর, কখনো গুরুদেব বলে ডাকি। এ নাকি দেবত্ব আরোপের প্রয়াস, ভক্তিরসেরই রকমফের।

ইতিহাস খুঁটিয়ে দেখলে কিন্তু বোঝা যায়, এ হলো আংশিক সত্য। রবীন্দ্রনাথকেও একসময় ভয়ানক ব্যঙ্গ – বিদ্রুপ ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আধুনিক সোশ্যাল মিডিয়ায় যে বীভৎস ট্রোলিং দেখতে পাওয়া যায় তার সঙ্গে অবশ্য একটা তফাৎ ছিল। সেসময় প্রযুক্তির কল্যাণে সবার হাতে কলম বা কি প্যাড জোটেনি, – ভাগ্যিস !

তবু সমালোচনার নামে ব্যক্তি আক্রমণ এমন জায়গায় পৌঁছতো, তাতে ওনার মতো স্থিতপ্রাজ্ঞ মানুষও কখনো কখনো বিচলিত হতেন, আঘাত পেতেন। অনেক অভিমানে তিনি লিখেছিলেন –

"লোকে আমায় নিন্দা করে
নিন্দা সে নয় মিছে
সকল নিন্দা মাথায় ধরে
রব সবার নীচে।"

দীর্ঘায়ু ছিলেন। জীবৎকালেই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগের যথাযথ জবাব দিয়ে গেছেন। শনিবারের চিঠি পত্রিকার আড়ালে সজনীকান্ত দাস প্রমূখের তীব্র সমালোচনার কাহিনী অনেকেই জানেন। এই কবি এবং প্রাবন্ধিক সজনীকান্তও একদিন নিজের ভুল বুঝতে পারেন। পরবর্তীকালে যাঁরা পরিচিত হয়েছিলেন 'রবীন-ধুততোর' (রবীন্দ্র উত্তরের বিপরীত অর্থে) নামে, তাঁদের অনেকেই পরিণত বয়সে এসে ছায়া খুঁজে পান এই বিশাল বটবৃক্ষের নিচে।

সমস্যাটা শুরু হল এরপর। সহজ পাঠ, গান আর কিছু কবিতার বাইরে যে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' তিনি রয়ে গেলেন অন্তরালে, মুষ্টিমেয় মানুষের বৌদ্ধিক চর্চার বিষয় হয়ে। যে মানুষটির লেখা আমাদের সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি সর্বস্তরে দিশা দেখাতে পারত, তাঁর চিন্তনের ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল সমাজের একটা বড় অংশ। আর ঠিক এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে চাইলেন কিছু মানুষ। তাঁরা দাবি করলেন সিলেবাস থেকে বাদ দিতে হবে ওনাকে। রবি ঠাকুরের লেখা পড়ে মানুষ যদি ধর্মীয় সম্প্রীতির কথা বলে, হিংসা বিভেদ যুদ্ধ ভুলতে চায়, উগ্র জাতীয়তাবাদের অন্তসারশূন্যতা নিয়ে সচেতন হয় অথবা ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্য বুঝতে শুরু করে, তাহলে তো ভারি মুশকিল! কিন্তু বিশ্ববরেণ্য কবির ছায়াটাই এত লম্বা, দেড়শো বছর পরেও এমন জনপ্রিয়, কাজটা খুব সহজে হত না। তাই শুরু হল ছায়া যুদ্ধ। ২০১৫ সালে রাজস্থানের গভর্নর কল্যাণ সিং এবং ২০২০ সালে রাজনৈতিক নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী দাবি জানালেন 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটিকে আর জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। অথবা অধিনায়ক শব্দটির পরিবর্তন দরকার। কারণ এটি নাকি রাজা পঞ্চম জর্জকে স্বাগত জানাবার জন্য লেখা হয়েছিল। মিডিয়া বা অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কেউই বললেন না যে, এ তথ্য সর্বৈব মিথ্যা। বলবেন কী করে? তার আগে জানতে হবে তো ! ঐ যে বললাম না, সহজ পাঠ, গান আর ...।

ফলে এই ভুলটিই সুকৌশলে ছড়িয়ে দেওয়া শুরু হল আম জনতার মধ্যে। যাতে নব্য দেশভক্তদের কাছে রবি ঠাকুরের ভাবমূর্তিটি কিঞ্চিৎ মলিন করা যায়। আমি জানতে পারলাম যখন হোয়াটস্যাপে এই বার্তা পড়ে, আমার এক বিভাগীয় কর্তা, চোখ বুঝে রায় দিলেন, এটা জানার পর ওনার লেখা কারো আর না পড়াই উচিত !

তখনই বুঝলাম, জীবদ্দশায় রবি ঠাকুর যে মিথ্যের জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন সেটা আরো বেশি মানুষের সামনে আনা এখন আমাদের দায়িত্ব।

বাতায়নের বিদগ্ধ পাঠকরা বেশিরভাগই হয়তো জানেন। তবু জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ও তার পিছনের সত্যটা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

১৯১১ সালে ব্রিটেনের রাজা পঞ্চম জর্জ এদেশে আসেন। সে বছর ২৭শে ডিসেম্বর, কংগ্রেসের অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে 'জন গণ মন' গানটি প্রথমবার মঞ্চে গাওয়া হয়। তার ঠিক পরেই রামভুজ দত্ত চৌধুরীর, পঞ্চম জর্জকে সম্মান জানিয়ে লেখা একটি হিন্দি গান গাওয়া হয়। দুটি ইংরাজি সংবাদপত্র ভুল করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে দুটি গানকেই সম্রাটের প্রশস্তি সঙ্গীত বলে বর্ণনা করেন। অমৃতবাজার ও অন্যান্য দেশীয় পত্রিকা কিন্তু এই ভুল করেনি।

এখান থেকেই রটনার সূত্রপাত। তবে সে সময় এরকম মিডিয়া বিস্ফোরণ ঘটেনি। তাই ঠিক বা ভুল কোনো মতটাই সেভাবে 'ভাইরাল' হতে পারেনি। কিন্তু নানা মহলে গুঞ্জন যে চলছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন তার প্রায় ছাব্বিশ বছর পর, বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী পুলিনবিহারী সেন কবিকে এই ব্যাপারে চিঠি লেখেন। ইতিমধ্যে ১৯১৯ সালে নাইট উপাধি ত্যাগের ঘটনা ঘটে গেছে। স্বভাবতই পুলিনবিহারী সেনের মনে সংশয়ের সঞ্চার হয়। কবি সেই চিঠির জবাবে যা লিখেছিলেন তাতেই সব দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটে। সেই ঐতিহাসিক দলিলের সামান্য অংশ এখানে দিলাম, – "রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনও বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও (ক্রোধ) সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জন-গণ-মন অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগ যুগ ধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ কোনো জর্জই কোনক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন।"

পুলিনবিহারী সেন পরবর্তী বছরগুলি রবীন্দ্র সান্নিধ্যেই কাটান। রবীন্দ্র রচনাবলীর সম্পাদনায় তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় রাখেন।

এরপরেও বহু রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ, জীবনীকার, প্রামাণ্য তথ্য দিয়ে এই অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন। কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, এই পঞ্চম জর্জকে নিয়ে ১৯৩৫ সালে সম্বর্ধনা-পুস্তক প্রকাশ হয়েছিল। সেখানে নানা জগতের বহু দিকপালের সঙ্গে কবিকেও লিখতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কবি লেখেননি। সে কথা মাথায় রাখলেও বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি এ অভিযোগ কত হাস্যকর ছিল।

কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন, হয়তো ভক্তিতে নয়, ভয়ে ... হয়তো সত্যিই ...

তাঁদের মনে করিয়ে দিতে চাই কবিগুরুর অকুতোভয় চরিত্রের কথা। জাপান ও আমেরিকা সফরে গিয়ে তাঁদের শাসকবর্গকে রুষ্ট করে, সাম্রাজ্যবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ইত্যাদি নিয়ে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তেমন নির্ভীকতা এর আগে বা পরেও কখনো দেখা যায়নি।

এ তথ্যসমূহ হয়তো নতুন নয় পাঠকের কাছে। তবু যেন মনে হয়, বিশ্বজুড়ে যেখানে যত বাংলাভাষী অক্ষর শ্রমিক আছেন তাদেরই দায়িত্ব, রবির কিরণ যাতে সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোনো উদ্দেশ্যমূলক কুটিল রটনা যেন ছায়া ফেলতে না পারে তাঁর বিপুল সৃষ্টির অঙ্গনে।

রুমঝুম ভট্টাচার্য্য

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে

আপামর বাঙালির জীবন জুড়ে আছেন যে রবি সেই রবির কিরণে নিজেকে সিক্ত ও শুদ্ধ করতে চায় না এমন বাঙালি বোধহয় দুর্লভ। বিশেষতঃ আমরা যারা বাঙলা ভাষাকে ভালবেসে ভাষা-শ্রমিকের পরিচয়ে বাঁচি আমাদের কাছে গুরুদেবকে নিয়ে কিছু লিখতে পাওয়ার সুযোগ মানে সে এক মস্ত আকাশে ডানা মেলা চিলের মতো অবাধ উড়ান। তাই এই বৈশাখে "বাতায়ন"-এর নিরন্তর সাহিত্যচর্চার প্রাঙ্গণে গুটি গুটি পায়ে হাজির হলাম। মনে লোভ রবি ঠাকুরকে নিয়ে কিছু লিখতে পারব, লিখে ধন্য হবো। লিখতে গিয়ে ওনার লেখা পড়ব, যত পড়ব তত সমৃদ্ধ হব। তত জানব তাঁর মুহূর্তের অনুভূতিগুলো, তাঁর জীবনদর্শন, তাঁর সুখের প্রকাশ, তাঁর দুঃখ হরণী শক্তি, তাঁর মৃত্যু দর্শন। আজ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষের যে কালো ছায়া ক্রমাগত আমদের গ্রাস করে চলেছে আমার মতে তার অন্যতম কারণ হল বিশ্ব চেতনায় অপরা শক্তির আধিক্য। লোভ, হিংসা, বিদ্বেষের মতো অপরা শক্তি জমা হতে হতে যখন হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তখন প্রকৃতি চরম প্রতিশোধ নিতে বাধ্য হয়। এই মহা দুঃসময়ে তাই বিশেষ করে রবীন্দ্র চর্চা অত্যাবশকীয় হয়ে উঠেছে। শুধু বাঙালি নয় সমগ্র বিশ্বের দরবারে নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদেরকেই পালন করতে হবে। কারণ রবীন্দ্রনাথ আসলে মানবতাবাদী এক দর্শন। যে দর্শন এই পৃথিবীর বুকে নব চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে শান্তি, বিশ্বপ্রেম। রবীন্দ্রনাথ কোনও ব্যক্তি নন রবীন্দ্রনাথ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। আজ দেড়শো বছর পরেও তিনি সমান প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন রচনায় অক্ষরের পরতে পরতে তিনি আসলে শ্বাশত সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সেই সত্য যা চিরন্তন, অমর। তাই আজও আমরা হাত পাতি আমাদের প্রাণের ঠাকুরের কাছে। গঙ্গা জলেই গঙ্গা পুজো সারি ... "প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে / মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।"

কি লিখব? কেন লিখব?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে দুটো প্রধান প্রশ্ন আমার মনে উঠেছে। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে দু'বাঙলায় এত বড় বড় লেখক, গবেষকদের কাজ রয়েছে যে আমি নতুন করে কি লিখব ? দ্বিতীয়তঃ আমি যা লিখতে চলেছি তা কেনই বা লিখব ? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হিসাবে আমি নিজের লেখার স্বপক্ষে এই যুক্তি খাড়া করেছি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্ব জোড়া নাম থাকতে পারে তবু তাঁর মধ্যে একদম ছা-পোষা সাধারণ একজন মানুষ ছিল সেই মানুষটার সঙ্গে সাধারণ লোক খুব সহজেই নিজেকে আইডেনটিফাই করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ মানেই গুরু গম্ভীর এক গবেষণা নয় সহজ রবিকে, আমাদের কাছের রবিকে অনুসন্ধান করার প্রয়াসেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। কথায় আছে "কান টানলে মাথা আসে"। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরে স্বভাবতঃই ঠিক হয়ে যায় কি লিখব। ব্যক্তিগত পরিসরে যেখানে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বারবার উন্মুক্ত করেছেন স্বামী হিসাবে, পিতা হিসাবে, বন্ধু হিসাবে, শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে সেই চিঠি ছাড়া কোথায় বা পাব আমাদের আপন সেই সহজ রবিকে। দৈনন্দিন জীবনের রবিকে চিনে নিতে গেলে তাঁর লেখা চিঠিই যে সব থেকে কার্যকরী উপায় সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন তাঁর "পথে ও পথের প্রান্তে" বইয়ের ভূমিকায়।

তিনি লিখছেন, "চিঠির সাহিত্যে ধরা দেয় লেখকের কাছঘেঁষা জগতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি প্রতিধ্বনি, তার ক্ষণিক হাওয়ার মর্জি আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে থাকে সদ্য প্রত্যক্ষ সংসার পথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ।" অর্থাৎ চিঠিতে প্রতিফলিত হয় লেখকের মুহূর্তের চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ, বিশ্বাস ইত্যাদি। তাতে থাকে না

কল্পনার মোড়ক, বরং প্রিয়জনের কাছে একান্তে নিজেকে নির্দ্বিধায় উন্মোচিত করেন। বর্তমান প্রবন্ধটিতে সেই অকৃত্রিম ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে দেখার প্রয়াসেই "চিঠির রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধের অবতারণা।

রবির ডাকঘর

ক্ষিতিমোহন সেনকে একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আমার লেখার চেয়ে কম হবে না আমার চিঠি। প্রত্যেকের কাছে আমার স্টাইল ভিন্ন। কিছুতেই একজনকে অন্যের লেখা স্টাইলে লিখতে পারি নে।" রবির ডাকঘরে অসংখ্য চিঠির আনাগোনা। রবি ঠাকুরের চিঠির সংখ্যা পাঁচ হাজার। ইংরাজীতে লেখা চিঠিগুলিকে ধরলে পত্র সংখ্যা আট-নয় হাজারের কম হবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম চিঠি লিখেছিলেন তাঁর বাবামশাইকে। সন-তারিখের হিসাবে সেটা সম্ভবতঃ ২৩ শে অগস্ট ১৮৭০ সাল তখন রবির বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। রুশ আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হয়ে মা সারদামণি রবির স্মরণাপন্ন হলেন, "রাশিয়ানদের খবর দিয়ে কর্ত্তাকে একখানা চিঠি লেখ তো !" জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "মাতার উদ্বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি।" সেই চিঠির উত্তর রবি পেয়েছিলেন। পিতা বালকের এই উদ্বেগ দূর করতে লিখেছিলেন, "ভয় করিবার কোন কারণ নাই, রাশিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন।" সেই থেকে রবির চিঠি লেখা শুরু। রবি নিজে লিখেছেন বাবার চিঠির উত্তর পেয়ে উৎসাহিত হয়ে তিনি প্রতিদিন জমিদারী সেরেস্তার মহানন্দ মুন্সীকে চিঠি লেখায় সহায়তা করার জন্য উপদ্রব করতে লাগলেন কিন্তু মাশুলের অভাবে সে সব চিঠি হিমালয় যাত্রা করতে পারল না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বালক বয়স থেকেই চিঠি লেখার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর এই স্মৃতিচারণ থেকে। তার পর থেকে দীর্ঘ একাত্তর বছর ধরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তিনি হাজার হাজার চিঠি লিখেছেন। সেই সব চিঠির অক্ষরে অক্ষরে ছড়িয়ে আছে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র নিয়ে অনেক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিশ্বভারতীর ১৯ খন্ডে প্রকাশিত "চিঠিপত্র" সংকলন। এতে ৭০ জনকে লেখা চিঠিপত্রের সংখ্যা হল ২৫৬৮ টি। ছিন্নপত্র ও ভানুসিংহের পত্রাবলী মিলিয়ে আরও শ'দুয়েক চিঠি সংকলনের আকার পেয়েছে। নির্মল্কুমারী মহালনবিশকে লেখা চিঠিগুলি থেকে বাছাই করে "পথে ও পথের প্রান্তে"র সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালের জৈষ্ঠ্য মাসে। এছাড়া য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি ইত্যাদিতে তাঁর লেখা চিঠি গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। তবে তাঁর লেখা চিঠির ৬০ শতাংশ এখনও অপ্রকাশিতই আছে। অর্থাৎ এই সব তথ্য পর্যালোচনা করে বলা চলতেই পারে রবির ডাকঘরের মাশুলের পরিমাণ নেহাত কম নয়।

চিঠির রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ যে অসংখ্য চিঠি লিখেছেন সে কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি। এই সব চিঠির মধ্যে আমরা একাধারে খুঁজে পাই বিশ্বভারতীর রূপকার, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথকে আবার অন্যদিকে খুঁজে পাই ভাবুক, প্রকৃতিপ্রেমে মত্ত রবীন্দ্রনাথকে। আবার এই চিঠিই হয়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিগত সংসার জীবনের সুখ দুঃখের দলিল। সব থেকে যে বিষয়টা মনকে নাড়া দেয় তা হল রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি মানুষের কাছে তার মতো করে নিজেকে উপস্থাপন করার ক্ষমতা। কত বড় সংবেদনশীল ও নিরহংকারী মানুষ হলে তবে খ্যাতির চূড়ায় অবস্থান করেও অবলীলায় তিনি মজার ছলে পত্রালাপ করেছেন রাণু-র সঙ্গে যার সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের। আবার যখন দেখি তিনি স্ত্রীকে চিঠি লিখছেন সেখানে ফুটে উঠেছে তাঁর সংসারের জন্য চিন্তা, ব্যাকুলতা, স্ত্রীর প্রতি স্বাভাবিক মান অভিমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সুত্রে যখন চিঠি লিখেছেন তখন তাঁর কর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেছে বারবার। বর্তমান প্রবন্ধে চিঠির রবীন্দ্রনাথকে আমরা খুঁজব রবীন্দ্র জীবনের ধাপে ধাপে। অর্থাৎ কিনা সেই প্রথম চিঠির সূত্রখানি ধরে। ১৮৭০ সালে লেখা সেই প্রথম চিঠির পর সতেরো বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ যাত্রার সময়ে যেসব চিঠি লেখেন সেগুলি পরবর্তীকালে "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বিলাত যাত্রা করেন ১৮৭৮ সালে। ইউরোপ যাওয়ার এক বছর পর এই পত্রগুলি "ভারতী" পত্রিকায় "য়ুরোপ প্রবাসী কোনো

বঙ্গীয় যুবকের পত্র" শিরোনামে নিয়মিত ছাপা হতে শুরু করে। কিন্তু ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হওয়ায় অবশেষে এই চিঠিগুলি ছাপা বন্ধ করা হয়। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কালে বন্ধুবর শ্রী চারুচন্দ্র দত্তকে উদ্দেশ্য করে লেখা ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন ইউরোপ থেকে লেখা সেই চিঠিগুলিতে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু লঘুত্বের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর বক্তব্য ছিল, "চিঠি যেগুলো লিখেছিলুম তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে খাঁটি স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে। বাঙালির ছেলে প্রথম বিলেত গেলে তাঁর ভালো লাগবার অনেক কারণ ঘটে। সেটা স্বাভাবিক, সেটা ভালোই। কিন্তু কোমর বেঁধে বাহাদুরি করবার প্রবৃত্তিতে পেয়ে বসলে উল্টো মূর্তি ধরতে হয়। বলতে হয় আমি অন্য পাঁচজনের মতো নই। ... সেটা যে চিত্তদৈন্যের লজ্জাকর লক্ষণ এবং অর্বাচীন মূঢ়তার শোচনীয় প্রমাণ, সেটা বোঝবার বয়স তখনো হয় নি"। এই চিঠিগুলি কাকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছিলেন সে বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে মতান্তর আছে। এক দলের মতে এগুলি নতুন বৌঠানকে (জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী) উদ্দেশ্য করে লেখা। আবার এক দল মনে করেন রবি এগুলি বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন। তবে রবিজীবিনীকার শ্রী প্রশান্ত কুমার পালের মতে এর মধ্যে কিছু চিঠি তিনি বৌঠানকে লেখেন। কিছু চিঠি কোনও পুরুষ মানুষের উদ্দেশ্যে লেখা। প্রথম পত্রে তরুণ রবীন্দ্রনাথ জাহাজের "লেডিদের" যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে করে আজকের দিন হলে নির্ঘাৎ তাঁকে বডি শেমিং-এর দায়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলড হতে হত। তিনি লিখেছেন, "আমাদের জাহাজে লেডির অভাব ছিল না, কিন্তু জেন্টেল ম্যানরা সর্বদা খুঁত খুঁত করতেন যে, তার মধ্যে অল্পবয়স্কা বা সুশ্রী একজনও ছিল না। একজন এত লম্বা, তাঁর ঠোঁট এত বন্ধুর, তাঁর মুখে এত দাগ, তাঁর দাঁতের এত দৈর্ঘ্য, তাঁর আহারের পরিমাণ এত অপরিমিত যে, তেমন দুটো পুরুষ সচরাচর খুঁজলে পাওয়া যায় না। একজন আছেন তাঁকে জ্যামিতিশাস্ত্রের রেখা বলা যেতে পারে। তাঁর শরীর লম্বা, মুখ লম্বা, হাত লম্বা, পা লম্বা, চোখ ছোটো, নাক ছোটো, মাথা ছোটো।" পঞ্চম পত্রে ইঙ্গবঙ্গদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যগুলিও অনেকক্ষেত্রে বেশ চড়া সুরে ব্যঙ্গের আকার ধারণ করেছে। তিনি লিখেছেন, "এখন তোমরা বুঝতে পারছ, কি কি মশলার সংযোগে বাঙালি বলে একটা পদার্থ ক্রমে বেঙ্গলো-আঙ্গলিক্যান কিম্বা ইঙ্গ-বঙ্গ নামে এক খিচুড়িতে পরিণত হয়।"

এই পত্রগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গবঙ্গদের সম্বন্ধে যেমন কঠিন সমালোচনা ও ব্যঙ্গ করেছিলেন সেই রকম বিলাতের ধনী পরিবারের রমণীদের বিলাসিতার প্রতিও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। এমনকি তিনি সে দেশের সঙ্গে তুলনা করে এ' দেশের রীতিনীতি বিশেষতঃ স্ত্রী স্বাধীনতার অভাব ও গুরুজনদের সঙ্গে ব্যবহারের প্রচলিত রীতির সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য করেছেন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই পরবর্তীকালে "ভারতী"পত্রিকায় চিঠি প্রকাশ বন্ধ করা হয়।

আসলে এই পত্রগুচ্ছতে তরুণ রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলো বলতে চেয়েছেন তা হয়তো সে সময়ের প্রেক্ষিতে বিচার করলে অনেকাংশে সত্য কেবল আবেগের আতিশয্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেই সব মন্তব্য গুরুজনদের চোখে প্রগলভ ঠেকেছে। প্রথম ইউরোপ যাত্রার ব্যাপারে তাঁর অনীহা, গুরুজনদের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত, সমুদ্র যাত্রার প্রবল অস্বস্তি সব মিলে তরুণ রবির মনে বিরূপ ভাব তৈরি হয়েছিল তারই ফল স্বরূপ সে দেশের সমাজ, রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যগুলি কখনও কখনও মাত্রারিক্ত রূঢ় হয়েছে অথবা এ কথাই সত্য যেমনটা তিনি লিখেছেন সেই সময় তারুণ্যের প্রাবল্যে স্রোতের উল্টোমুখে হাঁটার তাগিদ থেকেই বিদেশ যে তাঁর কোনও মতেই ভাল লাগে নি এমনটা প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন তিনি। কারণ যাই হোক তিনি শ্রী চারু চন্দ্র দত্তকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, "সাহিত্যে সাবালক হওয়ার পর থেকেই ঐ বইটার 'পরে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। বুঝেছি, যে দেশে গেছিলুম সেখানকারই যে সম্মান হানি করা হয়েছে তা নয়, ওটাতে নিজেরই সম্মানহানি। বিস্তর লোকের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও বইটা প্রকাশ করিনি।" চিঠিগুলি বই আকারে প্রকাশের কালে সেটি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পরিমার্জনা করেছেন। "এ লেখার কোন কোন অংশকে লেখক স্বয়ংগ্রাহ্য এবং ত্যাজ্য বলে স্বীকার করেছে সেটা জানিয়ে রেখে দিলুম" এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

এর পরবর্তী পর্যায়ে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা চিঠিতে আমরা খুঁজে পাব স্বামী রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় ১৮৮৩ সালে, জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি থেকে। পাত্রী যশোর জেলার ভবতারণী পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন করে

যিনি মৃণালিনী। বিয়ের সময় পাত্রের বয়স ছিল ২২ বছর ৭ মাস আর পাত্রীর বয়স ছিল ৯ বছর ৯ মাস। এরপর ছ' বছর কেটে গেল। মৃণালিনীর সমস্ত রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল। রবির উপযুক্ত হতে হবে তাঁকে। তারই মধ্যে দু' সন্তানের জননী হন তিনি। রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকে জমিদারী পরিদর্শনের ভার পেলেন। সেই কারণে বড় কন্যা মাধুরীলতা ও শিশু পুত্র রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে মৃনালিনী ২৫ শে নভেম্বর ১৮৮৯ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাড়ি জমালেন শিলাইদহের উদ্দেশ্যে। শুরু হল তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাইরে নিবিড় যৌথ যাপন। রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পরিদর্শনের কাজে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়াতেন সে সময়ে। শাহাজাদপুর থেকে লেখা একটি চিঠিতে (সাহাজাদপুর। জানুয়ারী ১৮৯০) রবি লিখছেন, "ভাই ছোট বউ, যেমনি গাল দিয়েছি অমনি চিঠির উত্তর এসে উপস্থিত। ভালমানসির কাল নয়। কাকুতি মিনতি করলেই অমনি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করেন আর দুটো গালমন্দ দিলেই একবারে জল। এ'কেই তো বলে বাঙ্গাল ! ছি ছি ছেলেটাকে পর্যন্ত বাঙ্গাল করে তুল্লে গা !" এখানে রবীন্দ্রনাথ নেহাতই স্বামী। রবীন্দ্রনাথ শুধু চিঠি লিখতে নয় চিঠি পাওয়ার ব্যাপারে ভারি ব্যাকুল হতেন। চিঠি না পেলে তিনি রীতিমতো ক্ষেপে উঠতেন, বা গভীর অনুযোগ জানাতেন। সে কথা বিভিন্ন চিঠির প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই। বারবার চিঠির অপেক্ষায় ব্যাকুল হয়েছেন তিনি। বিশেষতঃ স্ত্রীর কাছে বিভিন্ন সময় এ ব্যাপারে বারবার অনুযোগ জানিয়েছেন। ওই চিঠিতেই আরও লিখছেন, "এই রকম করে উঠে পড়ে লাগলে তবে টাকা হয় ! তোমরা তো কেবল খরচা কর্ত্তে জান – এক পয়সা ঘরে আনতে পার ?" এই রবি যে মৃণালিনীর স্বামী, ঘরের উপার্জনক্ষম গৃহকর্তাটি, আর পাঁচটা বাঙালি স্বামীর মতো তাঁরও ওই এক কথা অর্থ উপার্জন যে করে সেই তার মর্ম জানে, খরচ করায় কৃতিত্ব আর কি ? এই চিঠির শেষে প্রেরকের স্বাক্ষরে লেখা "শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"। ওই বছর বন্ধু লোকেন পালিত বিলেত যাচ্ছেন শুনে এবং মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথও বিলেত যাচ্ছেন শুনে রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন তিনিও বিলেত যাবেন। ২২ শে অগস্ট রওনা দিলেন তিনি। এডেন থেকে স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে (২৯ শে অগস্ট) রবি লিখছেন, "... রবিবার দিন রাত্রে আমার ঠিক মনে হল আমার আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে জোড়াসাঁকোয় গেছে। একটা বড়ো খাটে একধারে তুমি শুয়েছ আর তোমার পাশে বেলি খোকা শুয়ে। আমি তোমাকে একটু আধটু আদর করলুম আর বললুম ছোট বউ মনে রেখো আজ রবিবার রাত্তিরে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলুম – বিলেত থেকে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে কিনা। তারপর বেলি খোকাকে হাম দিয়ে চলে এলুম ..." ওই চিঠিতে পরের দিকে লিখছেন সহযাত্রীর মেয়েদের দেখে তাঁর নিজের শিশু কন্যার কথা মনে পড়ছে। "তাদের দেখে আমার নিজের বাচ্চাদের মনে পড়ে। কাল রাত্তিরে বেলিটাকে স্বপ্নে দেখেছিলুম – সে যেন স্টীমারে এসেছে – তাকে এমনি চমৎকার ভাল দেখাচ্ছে সে আর কি বলব – দেশে ফেরার সময় বাচ্চাদের জন্য কি রকম জিনিস নিয়ে যাব বল দেখি।" বিরহকাতর স্বামীর আত্মা শরীর ত্যাগ করে পৌঁছে যায় স্ত্রী-র শয়নকক্ষে, স্বপ্নে দেখেন আদরের দুলালী বেলিকে (মাধুরীলতা দেবী)। এ যেন এক অন্য রবীন্দ্রনাথ। ২২ তারিখ রওনা হয়ে ২৯ তারিখের চিঠিতে লিখছেন, "আজকাল কেবল মনে হয় বাড়ির মতো এমন জায়গা আর নেই – এবারে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর কোথাও নড়ব না।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহ কোণ কাতর এই সত্ত্বাকে আমরা তাঁর এই একান্ত ব্যক্তিগত চিঠিগুলোর মাধ্যমেই জানতে পারি। এ চিঠিরও প্রেরকের স্বাক্ষর "শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"। ওই সফরে লেখা আর একটি চিঠিতে রবি লিখেছেন "আমি অনেকগুলো অদরকারী কাপড় চোপড় এবং সেই বালাপোষখানা মেজবোঠানের হাত দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি – সেগুলো পেয়েছ তো ? না পেয়ে থাক তো চেয়ে নিয়ো। সেগুলো একবার লক্ষীর (জ্ঞানদানন্দিনীর দাসী) হাতে পড়লে সমস্ত মেজবোঠানের আলমারির মধ্যে প্রবেশ করবে। বেলির জন্যে আমি একটা কাপড় আর পাড় কিনে মেজবোঠানদের সঙ্গে পাঠিয়েছি – সেটা এতদিনে অবিশ্যি পেয়েছ ...।" সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে এতটাই ভাবতেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঘরকন্নার বিষয়গুলি তিনি নিয়মিত স্ত্রী-র সঙ্গে আলোচনা করতেন এ তারই নিদর্শনমাত্র। এই চিঠিতেই তিনি লিখছেন, "আমার শরীর এখন বেশ ভাল আছে – জাহাজে তিন বেলা যেরকম খাওয়া চলে তাতে বোধ হচ্চে আমি একটু মোটা হয়ে উঠেচি। আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে যেন বেশ মোটাসোটা ও সুস্থ দেখতে পাই ছোটবউ। গাড়িটা তো এখন তোমারি হাতে পড়ে রয়েছে রোজ নিয়মিত বেড়াতে যেয়ো, কেবলি পরকে ধার দিয়ো না।" স্ত্রী মৃণালিনীর চরিত্রের ইঙ্গিত এই চিঠি থেকে পাওয়া যায়। এই চিঠির

প্রেরকের স্বাক্ষর অনেক অন্তরঙ্গ। নীচে লেখা "রবি"। ১৮৯২ সালে শিলাইদহ থেকে লেখা একটি চিঠিতে "ছুটি"কে (চিঠিতে ওই নামেই তিনি স্ত্রীকে সম্বোধন করতেন) লিখছেন, "তুমি মনে মনে অসুখী অসন্তুষ্ট হয়ে থেকো না ছুটি। জান তো ভাই আমার খুঁৎখুঁতে স্বভাব, আমার নিজেকে ঠান্ডা করতে যে কত সময় নির্জ্জনে বসে নিজেকে কত বোঝাতে হয় তা তুমি জান না – তুমি আমার সেই খুঁৎখুঁতে ভাবটাকে দূর করে দিয়ো" ... রবীন্দ্রনাথের এই আত্মবিশ্লেষণ ব্যক্তিগত চিঠি ছাড়া কোথায় বা খুঁজে পাব আমরা। এর ছয় বছর পরে ১৮৯৮ সালে লেখা একটি চিঠিতে স্ত্রীকে রবীন্দ্রনাথ কি অসাধারণ জীবন দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করাচ্ছেন। ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের লেখা ও চিঠিপত্র থেকে জানা যায় মৃণালিনী ছিলেন স্বভাব শান্ত ও তিনি সকলকে নিয়ে থাকতে ভালবাসতেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নানা আত্মীয় স্বজনের ভিড় ও নানা সাংসারিক কূটকাচালি ও কোলাহল রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না। তিনি বুঝেছিলেন সেখানের পরিবেশ তাঁদের মনকে ক্লিষ্ট করবে। তিনি তাঁর দাম্পত্য জীবনের যে ছবিটি মনে এঁকেছিলেন সেটি তাঁর স্ত্রীকে লিখেছিলেন। "আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক, আমাদের চতুর্দ্দিক প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হোক, আমাদের সংসার যাত্রা আড়ম্বরশূন্য এবং কল্যাণপূর্ণ হোক, আমাদের অভাব অল্প উদ্দেশ্য উচ্চ চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক" ...। এমনকি সন্তানদের জন্য উদ্বিগ্ন পিতাকেও আমরা পাই স্ত্রীকে লেখা এই সব চিঠিতে। তিনি লিখছেন, "ছেলেদের জন্যে সর্ব্বদা আমার মনের মধ্যে যে একটা উদ্বেগ থাকে সেটা আমি তাড়াবার চেষ্টা করি। ওরা যাতে ভাল হয় ভাল শিক্ষা পায় আমাদের সাধ্যানুসারে সেটা করা উচিত, কিন্তু তাই নিয়ে মনকে উৎকণ্ঠিত করে রাখা ভুল।" আজ থেকে একশো বছর আগে পিতার ভাবনায় কি অসাধারণ দৃঢ়তা দেখতে পাই যখন তিনি লেখেন, "ওরা ভাল মন্দ মাঝারি নানা রকমের হয়ে আপন আপন জীবনের কাজ করে যাবে – ওরা আমাদের সন্তান বটে তবু ওরা স্বতন্ত্র – ওদের সুখদুঃখ পাপপুণ্য কাজকর্ম্ম নিয়ে যে পথে অনন্তকাল ধরে চলে যাবে সে পথের উপর আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নেই – আমরা কেবল কর্ত্তব্য পালন করব কিন্তু তার ফলের জন্য কাতরভাবে সস্পৃহভাবে অপেক্ষা করব না – ওরা যে রকম মানুষ হয়ে দাঁড়াবে সে ঈশ্বরের হাতে – আমরা সেজন্য মনে মনে কোনরকম অতিরিক্ত আশা রাখব না।" রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি পাওয়ার আশায় ব্যাকুল হতেন সে তো আগেই বলেছি। ১৯০০ সালে লেখা এক চিঠিতে তিনি স্ত্রীকে লিখছেন, "বড় হোক ছোট হোক ভাল হোক মন্দ হোক একটা করে চিঠি আমাকে রোজ লেখ না কেন ?" পরের দিকে রাগ করে লিখছেন, "যাই হোক চিঠি না পেলে কি রকম লাগে তোমাকে দেখাবার ইচ্ছে আছে।" ১৯০২ সালে উনিশ বছরের দাম্পত্য জীবন শেষ হয়ে গেল মৃণালিনীর অকাল মৃত্যুতে। কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে দীনেশচন্দ্র সেন কে চিঠিতে লিখলেন, "ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে। ইহা আমি মাথা নীচু করে গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্টকালকে সার্থক করিবেন।" মৃত্যুকে কি গভীর আত্মদর্শনে গ্রহণ করেছেন কবি ! মৃণালিনীর মৃত্যুর দশ মাস পরে মারা গেল তৃতীয় সন্তান রেনুকা। রেনুকার মৃত্যুর কয়েকমাস আগে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা এক চিঠিতে লিখছেন, "সংসারের তরণীটি নানাপ্রকার তুফানের উপর ভাসিয়ে নিয়ে চলেছি – কবে একটা বন্দরে টেনে এনে নোঙর ফেলতে পারব জানিনে। ছেলেদের মধ্যে কেউ একদিকে তো কেউ আর এক দিকে, আমার বিদ্যালয় এক দিকে এবং আমি আদিব্যাধি নিয়ে অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছি। বিচ্ছিন্ন সংসারটাকে এক জায়গায় জমাট করে নিয়ে বসবার জন্য মন ব্যাকুল হয়েছে। ..." এই চিঠি থেকে রবীন্দ্রনাথের সেই সময়ের উদ্ভ্রান্ত মনের অবস্থার পরিচয় মেলে। রেনুকা মারা গেল ১৯০৩ সালে। তারপর আবার রবির জীবনে নেমে এল সন্তান শোক। ১৯০৭ সালে শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গেল। মুঙ্গেরে ছুটি কাটাতে গিয়ে কলেরা হয়ে চির বিদায় নিল সে। রবীন্দ্রনাথের নয়নের মণি শমীকে হারিয়ে আরও একবার শোকের মুখোমুখি পড়লেন কবি। কয়েকদিন পর ৫ই ডিসেম্বর লিখলেন কাদম্বরী দত্তকে লিখলেন, "ঈশ্বর আমাকে বেদনা দিয়েছেন, কিন্তু তিনি তো আমায় পরিত্যাগ করেন নাই – তিনি হরণ করিয়াছেন পূরণও করিবেন। আমি শোক করিব না – আমার জন্যও শোক করিয়ো না।" এ কি নির্মোহ দৃষ্টি! এ যেন এক সিদ্ধ ঋষির উচ্চতর চেতনা। সে চেতনায় বিলীন হয়ে যত দূরেই যাওয়া যাক "কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই"। পঁচিশ বছর পরে কন্যা মীরার পুত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি চিঠিতে লিখছেন,

“শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি – সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারই মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায় – যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।” কখনও দেখি ঘোরতর সংসারী রবীন্দ্রনাথকে আবার কখনও খুঁজে পাই এই সত্যসন্ধানী ঋষিতুল্য ব্যক্তিত্বকে। বিভিন্ন চিঠির অক্ষরে অক্ষরে ছড়িয়ে আছেন এই সব রবীন্দ্রনাথ।

আনন্দ সেন

লক্ষ্মণরেখা

– "শুভ, কোন কথা হবে না। ইউ হ্যাভ ক্লোর্ড দেম্।"

আধ ঘন্টার প্রেজেন্টেশান আর আরো আধ ঘন্টার প্রশ্নোত্তরের পালা শেষ হলে শুভেন্দু বাথ্‌রুমে এসেছিল মুখেচোখে একটু জল দিতে। অঞ্জনের প্রশংসাটা সে শুষে নেয়। গত দুমাস ধরে শুভেন্দুর টীম প্রজেক্টটা নিয়ে খুব খেটেছে। একটা নতুন প্রডাক্ট লঞ্চ করছে তারা, পরবর্তী প্রজন্মের স্মার্ট ফোন। এটার ডেমো দেবার জন্যই ডালাস্ এসেছিল সে আর তার বস্ অঞ্জন। এ টি এন টি র বড়কর্তাদের সামনে প্রেজেন্টেশান। গত কয়েক রাত ভাল করে ঘুমোয় নি, নার্ভাস ছিল খুব। আজ মনে হচ্ছে এতদিনের কষ্ট সার্থক। কন্ট্রাক্টটা মনে হয় পেয়েই যাবে।

শুভেন্দু বিল্ডিঙের বাইরে বেরিয়ে সিগারেট ধরায়। এই সিগারেট খাওয়া নিয়ে অলির সাথে ওর প্রতিনিয়ত অশান্তি। শুভেন্দুর পক্ষে দাঁড় করাবার মত যুক্তি খুব একটা নেই – সুপারফিশিয়াল অ্যাডিকশান, যখন ইচ্ছে ছাড়তে পারে – এইসব বলে কিছুদিন চালাবার চেষ্টা করেছিল। তারপর যেদিন বুবাই তার সিগারেট চুরি করে টানতে গিয়ে দম আটকে প্রায় নাইন ওয়ান ওয়ান কল করার অবস্থা হয়েছিল, সেদিন অলি তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল সে আর ছেলের সামনে সিগারেট খাবে না। এখন তাই শুধু বাইরে খায়, তবে কম্‌সম্, কিছুটা লুকিয়ে চুরিয়েই। এমনিতেই অ্যামেরিকাতে স্মোকার হয়ে থাকাটা এখন খুব ঝামেলার, প্রায় অদৃশ্য হয়ে থাকতে হয়।

শুভেন্দু রায়। প্যাসিফিক কম্যুনিকেশান সান ডিয়েগোর মার্কেটিং বিভাগের বেশ উঁচু আসনে রয়েছে সে। কলকাতার এক সাধারণ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের স্নাতক। চাকরীর শুরুটাও সাধারণ ছিল, আর পাঁচজনের মতই। দেশের কোম্পানির প্রজেক্টের সুবাদে অ্যামেরিকায় আসা। তারপর তার কাজে খুশি হয়ে অ্যামেরিকান কোম্পানির চাকরির প্রস্তাব, গ্রীন কার্ড, প্রথম চাকরি থেকে পরের চাকরি – খুব দ্রুত ঘটেছে এগুলো শুভেন্দুর জীবনে। আর পুরোটাই সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, সমতলে হাঁটা নয়। এই তরতর উন্নতির মূল চাবিকাঠি শুভেন্দুর কর্মদক্ষতা এবং কাজের প্রতি আনুগত্য। তার দলের প্রত্যেকটা কাজ সে নিজে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, বিশ্লেষণ করে, সমস্যা হলে পিছিয়ে যায় না, সামনে থেকে সমাধানের চেষ্টা করে। কাজের ব্যাপারে তার কোন আপোস নেই। একবার বুবাইয়ের ধুম জ্বর, দু তিনদিন ধরে চলছে, ঠিক সেইসময় একটা প্রজেক্টের ডেডলাইন। প্রতিদিন রাত দেড়টা দুটোয় বাড়ি ফিরেছে শুভেন্দু। অলি তাকে বাড়ি থেকে কাজ করতে বলেছে। শুভেন্দু বলেছে – "কি লাভ, কাজই তো করব।"

অলি রেগে বলেছে – "এ কেমন কাজ যার জন্য সংসারকে অস্বীকার কর ?"

শুভেন্দুর উত্তর – "সংসার যাতে ভাল থাকে, তোমরা যাতে ভাল থাকো, তার জন্যই তো কাজ। তাছাড়া এমারজেন্সী তো নয়। ডাক্তার বলেছেন একটু রেস্ট নিলেই বুবাই ঠিক হয়ে যাবে।"

– "জ্বর সেরে যাবে। স্মৃতি সারবে না। অসুস্থ দুচোখের সামনে একটা না দেখতে পাওয়া মুখের স্মৃতি।" মনে মনে বলে অলি।

শুভেন্দু অকৃতজ্ঞ নয়। প্রজেক্ট শেষ হলেই সে অলি আর বুবাইকে নিয়ে গেছে ইউরোপ। কি যে এঞ্জয় করেছিল বুবাই সেই ট্রিপ।

শুভেন্দু নির্দিষ্ট সময়ের বেশ খানিকটা আগেই এয়ারপোর্টে চেক-ইন করে নেয়। নাইন-ইলেভেনের পর

সিকিউরিটির কড়াকড়ির জন্য বড্ড সময় লাগে। গেটের সামনে এসে সে ল্যাপটপ খুলে বসে। তাকে ঘিরে অসংখ্য চলমান মানুষের ব্যস্ততা। প্লেন আসছে, যাচ্ছে। শুভেন্দু লক্ষ্য করে মানুষগুলো আলাদা, কিন্তু কোথাও তারা একরকম। কেউ ল্যাপটপে। কেউ ফোনে অনর্গল কথা বলছে, কেউ বা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে পাছে ফ্লাইট মিস করে। কেউ একমনে বসে পড়ছে বই। সবটাই একটা অপেক্ষা, একটা গন্তব্যে পৌঁছোনোর অপেক্ষা। তাপসদার একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায় শুভেন্দুর। – "জানিস শুভ, আমরা মানুষগুলো খুব ইঁদুরের মত, এদিক সেদিক যাই, একটু খুটখাট করি, এটা কাটি, সেটা কাটি, আবার নিজের গর্তে ঢুকি। পরদিন ফের নতুন খাবারের খোঁজ। সবাই দৌড়োচ্ছি, একটা অদৃশ্য বাঁশিওয়ালা বাজিয়ে চলেছে তার বাঁশি। শেষের দরজা টা অবশ্য একই, সবার জন্যই।"

তাপসদা। শুভেন্দুর অঙ্কের মাস্টারমশাই। অঙ্ক কত শেখাতেন মনে নেই, কিন্তু প্রচুর গল্প বলতেন তাপসদা। একটা শখের থিয়েটার দলে অভিনয় করতেন, সুন্দর ভারী গলা, যাকে বলে ব্যারিটোন। সেই গলায় একটার পর একটা আবৃত্তি করতেন তাপসদা। জয়, শঙ্খ, শক্তি, সুনীল, জীবনানন্দ, এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাপসদার একটা অদ্ভুত অনুভূতি ছিল। বলতেন – "রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত বাঙালীর কাছে রুমালের মত। সবসময় সাথে আছে। দরকারমত একটু মুখচোখ মুছে ক্লেদমুক্ত হই। বুড়োটা সব কিছু নিয়ে কবিতা লিখেছে, বুঝলি শুভ, সবকিছু।"

বুকভরা শ্বাস, আমার আকাশ, তৃষ্ণাতে সে জলও

সেই বুড়োটা, তোমরা যাকে রবীন্দ্রনাথ বলো।

তাপসদার কথা সেদিন পুরোপুরি বোঝেনি শুভেন্দু। কি করেই বা বুঝবে, রবীন্দ্রনাথের সাথে পাঠ্যবইয়ের বাইরে কতটুকুই বা পরিচয়। কিন্তু একটা ঘটনা মনে আছে। শুভেন্দুর বাবা চাকরী করতেন ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসে, সেবার একবছরের জন্য উড়িষ্যায় পোস্টেড্, একটা সার্ভের ব্যাপারে। পুজোর ছুটিতে মার সাথে শুভেন্দু চলেছে বাবার কাছে। ট্রেনটা সময়ের একটু আগেই এসে গেল স্টেশনে, সকালের আলো তখনও তৈরি হয়ে উঠতে পারে নি তাদের জন্য। একটা স্টীমার লঞ্চে তাদের নদী পার হতে হবে, মহানদী। সাইকেল রিক্সা শুভেন্দু আর মাকে নামিয়ে দিল লঞ্চ ঘাটে। সেদিন হেমন্তের শিরশিরানি গায়ে জড়িয়ে মার পাশে বসে ভোর হওয়া দেখেছিল শুভেন্দু। কেউ যেন একটা অদৃশ্য ডিমার দিয়ে আস্তে আস্তে আলো জালাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে পালটে যাচ্ছে রং, কালো থেকে ফিকে শাদা, তারপর গোলাপী, কমলা আর শেষে সোনালী। গাছের পাতা আর ফুল সেই আলোর নিয়ন্ত্রণে জাগছে, একটা স্লো মোশান ছবির মত। ঠিক সেই সময় আশ্চর্য ভাবে মাথার মধ্যে চলে এসেছিল তাপসদার মেঘমেদুর গলা –

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি // জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি

প্রভাত হল যেই কি জানি হল একি // আকাশ পানে চাই কি জানি কারে দেখি

পূরবমেঘমুখে পড়েছে রবিরেখা // অরুণ রথচূড়া আধেক যায় দেখা

তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব // মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব।।

সেদিনের মত মার পাশাপাশি বসার সুযোগ আর কখনও হয়নি শুভেন্দুর। জ্ঞান হবার পর থেকে সংসারের হাঁড়ি ঠেলতেই দেখেছে মাকে। শুনেছে বিয়ের আগে মা নাকি খুব ভাল নাচতেন। মাকে নাচতে দেখেনি শুভেন্দু। শুধু একবার গভীর ঝড়জলের রাত্রে ঘুম ভেঙে মাকে পাশে না দেখে সে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছিল। দেখেছিল মা বসে আছেন বারান্দার কালো পাথরে বাঁধানো বেদীটার উপর। বুকে চেপে আছেন একজোড়া ঘুঙুর। রাস্তার আলো ভাঙছে মায়ের গালের উপর। আর হৃদয়ের কোন গোপন ক্ষরণ হতে উৎসারিত বেদনার আর্দ্রতা স্নান করছে সেই আলোয়।

পরদিন মাকে জিজ্ঞেস করাতে মা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কে জানে, হয়তো সেখানে বাবা ছিলেন বলেই। ভেবেছিল পরে বড় হয়ে একদিন জেনে নেবে। তার আর সুযোগ হয়নি। সে বড় হয়েছিল, কিন্তু মা বুড়ো হননি। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মার অসুখটা ধরা পড়ল, প্যাঙ্ক্রিয়াটিক ক্যান্সার। ডাক্তার বলেছিলেন অ্যাডভান্সড স্টেজ, সার্জারি হলে ছমাস, না হলে আর একটু বেশি বাঁচবে। শুনে বাবা কাকারা বলেছিলেন ওষুধই ভালো। এসব ওর পরে শোনা কথা, চোখের সামনে যেটা দেখেছিল সেটা মার তিলে তিলে না বাঁচার দিকে এগোনো। মার ফর্সা, স্বাস্থ্যজ্জ্বল চেহারাটা শুকিয়ে কালো, অস্থিসর্বস্ব হয়ে যেতে দু বছরের বেশী লাগে নি। শেষের দিকে মা আর কোন খাবার খেতে পারতেন না, খেতে খেতেই কাপড়ে চোপড়ে হয়ে যেত। অসুখ আস্তে আস্তে বুদ্ধিবৃত্তিকে গ্রাস করেছিল, সারাদিন মা দিন রাতের নার্সের সাথে খাবার খেতে চেয়ে ঝগড়া করতেন, মুখরোচক খাবারের জন্য ছোঁকছোঁক করতেন। শুভেন্দু দেখেছে অতিথিকে পরিবেশন করা খাবারের অবশিষ্ট তারা চলে যাবার পর ক্ষিপ্রবেগে তুলে নিয়ে মুখে পুরছেন। বাবা বাধ্য হয়ে রেফ্রিজারেটারে তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন, নার্সের কাছে চাবি থাকত। একদিন রাতে ভীষণ চ্যাঁচামেচি শুনে শুভেন্দু ঘুম ভেঙে দেখে নার্সের সাথে মার তুমুল ঝগড়া। মা নাকি নার্সের ব্যাগ থেকে চাবি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন। এইসময় শুভেন্দু মাকে দেখত দূর থেকে, কাছে ঘেঁষত না বিশেষ। মার কি হয়েছিল, কেউ তাকে বলেনি। তবে সে বুঝেছিল যা হয়েছে তা হয়তো সারার নয়।

মা চলে যান শুভেন্দুর মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক পরেই, হয়তো তার পরীক্ষাটা যাতে ঠিকমত হয়, সেকথা ভেবেই। বাবা তারপর একবছর যুদ্ধ করেছিলেন একাকীত্ব আর ডিপ্রেশানের সাথে। বাবার ঘরে বিছানায় তাঁর নিথর হয়ে যাওয়া দেহের পাশে একটা টেবিলের উপর বঙ্গলিপি খাতা থেকে ছেঁড়া পাতায় লেখা ছিল –

আজিকে হয়েছে শান্তি, জীবনের ভুল ভ্রান্তি সব গেছে চুকে

রাত্রিদিন ধুকধুক, তরঙ্গিত দুঃখ সুখ থামিয়াছে বুকে

যত কিছু ভালমন্দ, যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিছু আর নাই

বলো শান্তি, বলো শান্তি, দেহ সাথে সব ক্লান্তি হয়ে যাক ছাই ।

নীচে দুটো শব্দ – শুভ, সরি।

** ** ** ** ** ** **

দিস ইস আ প্রি বোর্ডিং কল ফর অ্যামেরিকান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট টু টু ওয়ান ওয়ান গোয়িং টু সান দিয়েগো।

চট্‌কা ভাঙে শুভেন্দুর অ্যানাউন্সমেন্টে। ঝটপট ল্যাপটপ গুটিয়ে তৈরি হয় প্লেনে ওঠার জন্য। ও সচরাচর বিজনেস ক্লাসে যাতায়াত করে, এবার সেক্রেটারির গাফিলতির জন্য কপালে ইকনমি। ফলে লম্বা লাইনের পিছনে দাঁড়াতে হয় তাকে। প্লেনে উঠে ল্যাপটপ খুলে দেখে ব্যাটারি শেষ। এয়ারপোর্টে বসে দিবাস্বপ্ন দেখার সময় খেয়াল ছিল না। খেলে যা। এখন এতটা পথ কর্মহীন পূর্ণ অবকাশ। তার সিট জানলার পাশে। সহযাত্রীর কনুই আর হাঁটু একটা অদৃশ্য সীমা লঙ্ঘন করে মাঝে মাঝেই তার জায়গা জবরদখল করে নিচ্ছে। মনে মনে সেক্রেটারির মুণ্ডপাত করে চোখ বন্ধ করে হেড রেস্টে মাথা হেলিয়ে দ্যায় শুভেন্দু।

– "অলকানন্দা মুখার্জী। আমার স্কুলের বন্ধু, সঙ্গীতভবনের গ্র্যাজুয়েট, দারুণ গাইছে। আজ শিশিরমঞ্চে প্রোগ্রাম আছে। শুনতে যাবি ?" শুভেন্দুর মাসতুতো দিদি সহেলি কলকল করে ওঠে। বাবার মৃত্যুর পর মাসীর বাড়িতে থেকে পড়াশুনো শেষ করেছে শুভেন্দু। বেঙ্গালুরুতে একটা আই টি তে জয়েন করেছে বছর দুয়েক, সঙ্গে করছে একটা ম্যানেজমেন্টের কোর্স। কলকাতায় এসেছিল গায়ের ব্যথা মারতে, সপ্তাহ খানেকের জন্য।

– "আমাকে ছাড়ু। আমি একটু চিল্যাক্স করতে এসেছি বস্। সারা সন্ধ্যে ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত একটু চাপ হয়ে যাবে।"

– "প্লীজ শুভ। আমার ও তো একটা এসকরট্ দরকার, রাত হবে ফিরতে।" সহেলি তার থেকে বছর তিনেকের বড় হলেও ওরা খুব ঘনিষ্ঠ, সমবয়সী বন্ধুর মত। ছোটবেলা থেকেই।

– "কিন্তু আমাকে একবার জ্যেঠুর বাড়িতেও যেতে হবে তো।" শুভেন্দু শেষ চেষ্টা করে।

– "জ্যেঠুর বাড়িতে তুই কালও যেতে পারবি। আমি তোকে কখনও কিছু অনুরোধ করি না, এই একবার রিকুয়েস্ট রাখবি না ?"

কথাটা ডাহা মিথ্যে হলেও এটা নিয়ে তর্ক করা মুশকিল। ফলে যেতে বাধ্য হয়েছিল শুভেন্দু। আর শুনেছিল অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত, প্রাণভরে, এই প্রথম। অলি একঘন্টা গেয়েছিল, কিন্তু তার রেশ রয়ে গিয়েছিল শুভেন্দুর মনে সারারাত। কিছু একটা ছিল অলির গলায়। মনে হয়েছিল সে যেন গাইছে না, বলছে নিজের কথায়। ভাসছে একটা সুরের নৌকায়, আর ভাসাচ্ছে শুভেন্দুকে। অনুষ্ঠানের পর সহেলি আলাপ করিয়ে দিয়েছিল দুজনের। শুভেন্দু বেশী কথা বলতে পারে নি, তখনও একটা ঘোরের মধ্যে ছিল।

– "তোর বন্ধু কি গাইছে আবার নেক্সট চার পাঁচ দিনের মধ্যে ?" সহেলিকে প্রশ্ন করেছিল পরের দিন।

– "দেখিস, সম্পর্কে দিদি হয়।" হাল্কা ঠাট্টা করে সহেলি, কিন্তু খোঁজ এনে দেয় এক ঘরোয়া আসরের যেখানে অলি গাইবে দুদিন পরে। একটু কাঠখড় পুড়িয়ে একটা নিমন্ত্রণও যোগাড় করে ফেলে।

– "আপনার গান শুনলে মনে হয় একটা খোলা আকাশের নীচে বসে আছি। আর একটা বল্গাহীন বাতাস আমার চোখমুখ ধুইয়ে দিচ্ছে।" অনুষ্ঠানের শেষে শুভেন্দু বলে অলিকে।

– "ধন্যবাদ।" একটু লাল হয়ে গিয়েছিল কি অলি ?

– "আমি বেঙ্গালুরুতে থাকি। মাঝে মাঝে যদি কথা বলতে ইচ্ছে হয়, টেক্সট করতে পারি ?" আর একটু সাহসী হয় শুভেন্দু।

একটু থমকায় অলি। তারপর একটা কাগজে নিজের ফোন নম্বর লিখে দেয় শুভেন্দুকে – "ঠিক আছে, উত্তর নাও পেতে পারেন কিন্তু।"

উত্তর অবশ্য দিয়েছিল অলি। প্রথমবারেই নয়, শুভেন্দু বেশ কয়েকটা পাঠানোর পর যখন হাল ছেড়ে দিয়েছিল প্রায়, তখনই। একবার দরজা খোলার পর অবশ্য শুভেন্দুকে আর বেশি চেষ্টা করতে হয়নি। অলিকে কাছ থেকে জানার সময় বুঝেছে যে আদতে চাপা স্বভাবের অলির হৃদয় প্রকাশের জন্য টেক্সটের আড়ালটা অত্যন্ত জরুরী।

আর একটা জায়গা ছিল অলির ডানা মেলার। শুভেন্দু আর অলি বিয়ের পর গিয়েছিল সেখানে। বোলপুরে নামতে না নামতেই মুখচোখের চেহারা পালটে গেল অলির। অনেক চেনামুখের সাথে গল্প করতে করতেই সাইকেল রিকশা চেপে তারা পৌঁছে গেল ক্যাম্পাসে। পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে দুটো সাইকেল ধার করে বেরোল তারা শান্তিনিকেতনের রং আর গন্ধ মাখতে। প্রান্তিক, খোয়াই, কোপাই, সোনাঝুরি। অলি যেন অনেকদিন পর ঘরে ফিরেছে, তার সারা মুখ জ্বলছে এক অদ্ভুত আলোয়। সোনাঝুরিতে পৌঁছে পাগলের মত ছুটতে থাকে অলি, এক সময় বসে পড়ে মাটিতে, মাথায় গায়ে মেখে ন্যায় ধুলোমাটি। বুকের ভেতর থেকে উৎসারিত হয় সুর – "আমার মুক্তি আলোয় আলো"। আর শুভেন্দু মুগ্ধ হয়ে দ্যাখে তার এই অপরিচিত নববধুকে – সাঁওতাল মেয়ের খোঁপা থেকে ফুল খুলে পরে নিচ্ছে নিজের খোঁপায়, গলা মেলাচ্ছে বাউলের গলায়, অতি অনায়াসে যে তার শহুরে পোষাক সরিয়ে রেখে মিশে যাচ্ছে শান্তিনিকেতনের বাতাসে। অনেকদিন পর ফিরে আসে তাপসদার গলা –

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে // তুমি বিচিত্ররূপিণী

অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে // আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে

দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে // তুমি চঞ্চলগামিনী ।

শুভেন্দু যেদিন জানতে পারল সে আমেরিকা যাবে, পরের দিনই কলকাতা এসে অলির সাথে দ্যাখা করে। লেকের ধারে বসে তাকায় অলির চোখের দিকে

– "আমাকে বিয়ে কর অলি, পূর্ণ করো আমায়।"

– "কিন্তু শুভ, তোমার আমার পথ যে ভিন্নমুখী। তুমি থাকো তোমার কাজকর্ম নিয়ে, তার বাণিজ্যিক ভাবনা, প্রয়োগ, মূল্যায়ন, সব জাগতিক। আমার ঘোরাফেরা অলস রোমান্টিকতার পরিধির মধ্যে। আমার শিল্প মানুষকে আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু সেটাকে পেশা হিসেবে নিতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, ওদেশে থেকে তো আমি পারব না। কোন রুটি রুজির যোগাড় তো করতে পারব না।"

– "রুটিরুজির যোগাড় আমি করব অলি। তুমি মনের আনন্দে গান কোর, এখানে এসে কাটিয়ে যেও একটা বড় সময়। আমার আর তোমার গান, তোমার এই দুই ভালবাসার সাথে থেকো।"

– "কিন্তু যদি না পারি, যদি আমার গান চলে যায়।"

– "অলি এ যাওয়া তো সাময়িক, আমরা ফিরে আসব তো ঠিক। আর তুমি তো আমার জন্যও গাইবে গান। তোমার গান হবে আমার প্রাণের শান্তি, আমার ঘরে ফেরার তাড়া। একটা গাইবে আজ আমার জন্য ?

গেয়েছিল অলি – "আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন"।

শুভেন্দু আর অলি রেজিস্ট্রি করেছিল এক মাঘী বিকেলে, খুব কাছের কিছু বন্ধু আর আত্মীয়স্বজন আর শুভেন্দুর মা বাবার ছবির সামনে। অলির বাবা মা চেয়েছিলেন সামাজিক অনুষ্ঠান করতে, কিন্তু শুভেন্দু চায় নি। অলিও আপত্তি করেনি শুভেন্দুর মুখ চেয়ে। সহেলি সাক্ষী হয়েছিল ওদের বিয়েতে – কপট রাগের ভান করে বলেছিল অলিকে – "ছোট ছেলেটার মাথা এমন করে খায় ?"

আরো বছরখানেক লাগল শুভেন্দুর অলিকে নিয়ে আসতে আমেরিকাতে। অলির তখন গানের জগতে খানিক নাম ডাক হয়েছে। দুটো সিডি বেরিয়েছে। আমেরিকা তে আসার পর ও অলি মাঝে মাঝেই ফিরে যেত কলকাতায়, অনুষ্ঠান করত, গানের জগতের সম্পর্ক গুলোকে আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিত। তারপর বুবাই এল। ছোট্ট বুবাইকে নিয়ে হিমসিম খেতে লাগল অলি। কলকাতা, আমেরিকা দুজায়গাতেই। বুবাই স্কুলে ভর্তি হল। আস্তে আস্তে কলকাতায় যাতায়াত কমতে লাগল। ইতিমধ্যে শুভেন্দু ও উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছে কয়েক ধাপ। ওরা চলে এসেছে সান দিয়েগো তে। অলি জড়িয়ে গেল সংসারের ঘেরাটোপে। বনের পাখি বন্দী হল খাঁচায়।

প্রথম প্রথম অলি খুবই চেষ্টা করেছিল। সান দিয়েগোর বাঙালী সংখ্যা কতই বা। তবু তাদের নিয়ে একটু বসন্তোৎসব, একটু বৃক্ষরোপণ – অলির চেনা পৃথিবীর ছোঁয়া পাবার একটু প্রয়াস। কিন্তু কিছুদিন পরেই তার উৎসাহে ভাঁটা পড়তে লাগল। অলির চেনা পৃথিবী অন্যদের অচেনা। অভিনবত্বের চমকটা কেটে যাবার পর তারা আর বিশেষ আগ্রহ দেখাল না। অলির গান নিয়েও লাগল গন্ডগোল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপারে সে বিশুদ্ধতাবাদী, কোন আপোস করতে রাজী নয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাথে তার মতান্তর শুরু হল কি ধরনের প্রোগ্রাম হবে তাই নিয়ে। উপরি হিসেবে বাঙালীদের স্বভাবসিদ্ধ পরনিন্দা, পরচর্চা, দলীয় কোন্দল তো ছিলই। ভাল লাগেনি অলির। প্রতিবাদ করত সে। বাঙালী মহলে অহংকারী, নাক-উঁচু নাম কিনতে তার বেশী সময় লাগে নি।

– "তোমার কি দরকার বলত ওদের সাথে ঝামেলায় গিয়ে, গান গাইতে বলছে, দুটো গান গেয়ে দাও। আর যাদের নিয়ে গাইছ তারা তো কেউ দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র নয়। যতটুকু পারে গাইবে।" শুভেন্দু মাঝে মাঝে অলিকে বোঝানোর চেষ্টা করে।

– "কিন্তু কি গাওয়া হবে, কখন হবে, কিভাবে হবে – তাই নিয়ে আমার কোন মত থাকবে না ? ওভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া যায় না কি। এখানে ভাল গানের কদর কেউ করতে পারে না।"

– "কিন্তু তুমি তো নিজের আনন্দের জন্য গাও। কেউ কদর নাই করল।"

– "শুভ, প্রত্যেক শিল্পী চায় তার শিল্পের স্বীকৃতি, অ্যাপ্রিসিয়েশান, একজন প্রকৃত সমঝদারের কাছ থেকে। সেটাই তার এগিয়ে চলার পাথেয়। শুধু নিজের জন্য গান আমি কেমন করে গাইব শুভ?"

– "শিল্পীর শিল্পকর্ম কি তাহলে হাততালির মোহে, অভিনন্দন কুড়োবার জন্য ? আর্ট ইস নট ফর আর্টস সেক ?"

– "আমি পারফর্মিং আর্টের কথা বলছি। কেউ কি ফাঁকা মাঠে পারফর্ম করে ? তাছাড়া হাততালির মোহ তোমার নেই ? যদি নাই থাকবে, তাহলে প্রত্যেকটা প্রেসেন্টেশান নিজে করো কেন ? তোমার জুনিয়রদের করতে বলো না কেন ?"

কথাটা সত্যি। গত কয়েকবছরে কাজ শুভেন্দুর জীবনকে গ্রাস করে নিয়েছে। সুপিরিয়ররাও তাদের এই কাজপাগল কলিগ্‌কে রীতিমত সমীহ করে চলে। কিন্তু সব পয়সারই তো উলটো পিঠ আছে। কাজের সাথে শুভেন্দুর এই অন্তরঙ্গতা থাবা মারতে শুরু করল সাংসারিক জীবনে।

এক ছুটির দিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে বুবাই শুভেন্দুকে বলে – "বাবা চলো একটা গেম্ খেলি।"

শুভেন্দু ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল আই প্যাডে।

– "কি গেম্ বুবাই ?"

– "গেসিং গেম্। তোমাকে বলতে হবে কি কি জিনিস আমার ফেভারিট।"

– "আচ্ছা, বল।"

– "বলোতো আমার মোস্ট ফেভারিট কালার কি ?"

– "লাল।"

– "হোলো না, ভুল। আমার সব চাইতে ফেভারিট কালার হল ব্লু।"

– "ও তাই ?"

– "আচ্ছা এবার বলোতো আমার সব থেকে ফেভারিট খাবার কি ?"

– "এটা আমি জানি, গোট মিট। কি ঠিক হয়নি ?"

– "এ বাবা, এটাও ভুল। চিংড়ি মাছ।"

– "সত্যি ? আচ্ছা আর একটা জিজ্ঞেস কর্।

– "আমার মোস্ট ফেভারিট ইন্ডিয়ান ফিল্ম স্টার কে ?"

– "শাহরুখ খান। বাবা তুমি কিচ্ছু পারোনি, জিরো পয়েন্টস।"

রোখ চেপে যায় শুভেন্দুর। প্রশ্ন করে যেতে বলে বুবাইকে একটার পর একটা। বুবাইয়ের সবথেকে প্রিয় খেলা, প্রিয় বই, প্রিয় সিনেমা, গান ... সবগুলো ভুল করে শুভেন্দু। বুবাই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

– "বাবা ইস আ লুজার, বাবা ইস আ লুজার।"

ডিশওয়াশারে ডিশ ঢোকাতে ঢোকাতে ব্যাপারটা খেয়াল করছিল অলি। এবার সে ছেলেকে বলে – "বুবাই, এবার বাবাকে একটু ব্রেকফাস্ট খেতে দাও। তোমার তো খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি এবার তোমার ঘরে গিয়ে খেলো। আমি একটু পরে আসছি। সুইমিং ক্লাসের জন্য রেডি হতে হবে।"

বুবাই উঠে যাবার পর ঠাণ্ডা গলায় বলে – "একদিন আসবে যখন বুবাই চাইবে তার বাবা এই খেলাটায় জিতুক, অনেক পয়েন্টস্ পাক। তখন কি করবে শুভ ?"

শুভেন্দু বুঝছিল সুর কাটছে। কারণে অকারণে অলি চীৎকার করে ওঠে, সেও মাথার ঠিক রাখতে পারে না। ঝগড়াঝাঁটি সব দাম্পত্য সম্পর্কেরই অঙ্গ, কিন্তু এই ঝগড়াগুলোর যেন কোন নির্দিষ্ট কারণ নেই। এগুলো কোন অজানা বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, একটা অদৃশ্য মানসিক পীড়ার প্রতিফলন।

একদিন শুভেন্দু অলিকে জিজ্ঞেস করে – "আচ্ছা, কি হয়েছে বলো তো ? আজকাল কথায় কথায় এত ঝগড়া হয় কেন ? আগে তো এমনটা ছিল না।"

অলি যেন এই প্রশ্নেরই অপেক্ষায় ছিল। – "জানি, শুভ জানি। আমিও তোমাকে বলব ভাবছিলাম। আর আমি এর সমাধানও জানি।"

– "জানো ?" অবাক হয়ে তাকায় শুভেন্দু।

– "হ্যাঁ শুভ। কলকাতায় ফিরে চলো। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে শুভেন্দু। তারপর আস্তে আস্তে বলে – "তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ?"

– "পাগল হইনি শুভ। তবে আর বেশিদিন এখানে থাকতে হলে হয়ে যাব। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি খোলা হাওয়ায় বাঁচতে চাই। লক্ষ্মীটি, ফিরে চলো।

– "আমি কি করে যাব আমার সব কিছু ফেলে ?"

– "সবকিছু মানে তো কাজ। তুমি সুপ্রতিষ্ঠিত, তোমার নাম ডাক আছে। ভাল কাজ পেয়ে যাবে। আমি গান গাইব প্রাণভরে। আমার বেশী কিছু চাই না। তিনজনে মিলে আমরা সুখে, স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারব।"

– "আমি কলকাতায় ফিরতে চাই না অলি। কলকাতার সাথে আমার বাবা মায়ের স্মৃতি, আমার অসম্পূর্ণ কৈশোরের স্মৃতি, আমি ভুলতে চাই সেগুলো।"

– "ওটা তোমার অজুহাত শুভ। কলকাতায় তোমার ভাল লাগার স্মৃতিও আছে। ওখানেই আমাদের দ্যাখা হওয়া, আমাদের হাত ধরে পথ চলা।

– "তাও। কলকাতা আমায় যা দিয়েছে, নিয়েছে তার থেকে অনেক বেশী।"

– "গান ছাড়া আমি বাঁচব না শুভ। আমাকে গাইতে দাও।"

– "বেশ তো, গাও না তুমি। এখন তো বুবাই একটু বড় হয়েছে, তুমি আবার কলকাতায় যাতায়াত শুরু কর।"

– "আমি তোমাকে আর বুবাইকে ছেড়ে থাকব ?"

– "তুমিই তো চাইছো ছেড়ে যেতে।"

– "আমি আমার গানের কাছে পৌঁছোতে চাইছি। কিন্তু তোমাদের ফেলে রেখে তো নয়। প্লীজ, কিছু একটা করো।"

– "ঠিক আছে, একটু ভেবে দেখি।"

– "তাড়াতাড়ি করো শুভ, দেরী কোরো না। আমাকে, আমাদের শেষ হয়ে যেতে দিও না।"

সেদিন শুনেছিল শুভেন্দু মিউসিক রুমে বসে অলি গান গাইছে একা একা। অনেক রাত, নাকি সারারাত – শুভেন্দু জানেনা, ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ফ্লাইট টা সময়ের কিছু আগেই সান দিয়েগো পৌঁছল। পার্শ্ববর্তিনী পুরোটা পথ ঘুমোলেন, তার মধ্যে বেশ কিছুটা সময় শুভেন্দুর বাঁ কাঁধটা কে বালিশ করে। প্লেন'টা টাচ ডাউন করতেই তিনি ধড়মড় করে উঠে ত্বরিতগতিতে স্মার্ট ফোন খুলে টেক্সট করতে শুরু করলেন। শুভেন্দুর টায়ার্ড লাগছে, বাড়ি ফিরে ভাল করে চান করতে হবে।

ট্যাক্সিটা বাড়িতে যখন নামিয়ে দিল শুভেন্দুকে, তখন আটটা বাজে। গ্রীষ্মকাল, ফলে চারিদিকে আলো ঝলমল করছে। বাড়িতে ঢুকে জুতোটা খুলতে খুলতে অভ্যাস বশে "আই অ্যাম হোম" বলতে গিয়ে থমকে যায় শুভেন্দু। খেয়াল হয় আজ বুবাই দৌড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরবে না। মাস ছয়েক হল বুবাইকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেছে অলি। যাবার তিনদিন আগে শুভেন্দুকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানায় অলি। বেশী কিছু বলেনি শুভেন্দু, চ্যাঁচামেচি, ঝগড়াঝাঁটি কিছুই করে নি। আর কতই বা করবে। এমনটা যে হতে চলেছে এটা হয়তো ও বুঝতে পারছিল। শুধু বলেছিল – "বুবাইকেও নিয়ে যাচ্ছ ?"

– "ওকে এখানে দেখবে কে ? তুমি ?" অলির গলায় হাল্কা ঠাট্টা।

– "কিন্তু ও-র স্কুল ..."

– "ও ওর মায়ের কাছে থাকবে শুভ, কলকাতার স্কুলে পড়বে। কলকাতায় যে ভাল স্কুলের অভাব নেই তা তো জানোই।"

– "কেন এটা করছ অলি ? আমি তো তোমার গানে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়াইনি।"

– "ঠিক। কিন্তু প্রেরণাও হও নি কখনও। তোমার কাজ আর আমার গান দুটো সমান্তরাল পথে চলেছে। খালি তোমারটা চলেছে দ্রুত, তোমার নির্দিষ্ট গন্তব্যে, এত দ্রুত যে তুমি খেয়ালও করো নি কতটা পিছনে পড়ে রয়েছি আমি, লক্ষ্যে পৌঁছোনর ব্যর্থ চেষ্টায়।

– "কি বলছ অলি ?"

– "ঠিকই বলছি। শেষ কবে তুমি আমার গান শুনতে চেয়েছ ভেবে দ্যাখো তো ?"

– "কিন্তু তুমি তো সারাক্ষণই গান গাও। কখনও গুণগুণ করে, কখনও খোলা গলায়। আমার তো ভাল লাগে শুনতে।"

– "সে তো আমার ইচ্ছেয় গাই শুভ। তোমার ইচ্ছেয় কই ? আমার গান হয়তো তোমাকে শান্তি দেয়, ঘরে ফেরার তাড়া আর দেয় না।"

– "তোমাদের চলবে কি করে ?" শুভেন্দু শুকনো গলায় প্রশ্ন করে।

– "আমার বন্ধু সুপর্ণা ওর স্কুলে একটা চাকরী যোগাড় করে দিয়েছে, মিউজিক টীচারের। একটা দুটো স্টুডিয়োর সাথে যোগাযোগ করেছি, কিছু মিউজিক ভিডিওর কথা এগোচ্ছে। আপাততঃ মা বাবার কাছে গিয়ে থাকব, কিন্তু ওদের মুখাপেক্ষী হয়ে নয়।"

একটু থেমে অলি বলে – "ভয় নেই, তোমার কাছে হাত পাতব না। অন্ততঃ আমার জন্য নয়।"

– "অলি প্লীজ, আমি কথাটা ওভাবে বলি নি।" কাতর শোনায় শুভেন্দুর গলা।

ফিরে যাবার পর অলির সাথে সপ্তাহে একবার কথা হয়, স্কাইপে। বলা ভাল বুবাইয়ের সাথে। অলি মাঝে মাঝে সামনে আসে। শুভেন্দু খাওয়াদাওয়া ঠিকমত করছে কিনা, প্রেসারের ওষুধটা ঠিকমত খাচ্ছে কিনা – এরকম দু চারটে প্রশ্ন করেই সরে যায়। প্রথম প্রথম অলিকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছে শুভেন্দু। এখন আর বিশেষ কথাও হয় না। সহেলির কাছে মাঝে মাঝে খবর পায়, অলি দু একটা অনুষ্ঠানে গান গাইবার সুযোগ পেতে শুরু করেছে, প্রশংসাও পেয়েছে অল্প।

শাওয়ারের তলায় বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে শুভেন্দু। ঠান্ডা জলের কণাগুলো তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে একটা আরাম ছড়িয়ে দিচ্ছিল। স্নান করে বেশ তরতাজা লাগে তার। একটা টী-শার্ট আর শর্টস পরে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরায়। তারপর কি মনে করে গেস্ট রুমের বন্ধ দরজাটা খোলে। চলে যাবার আগের কয়েকমাস অলি এখানেই শুত। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলতে দেখেছে এ ঘরে। শুভেন্দু খেয়াল করে বেডসাইড টেবিলের পিছনে একটা বই পড়ে আছে, নিশ্চয় ক্লীনারদের কাণ্ড। বইটা তোলে – সঞ্চয়িতা। আনমনে উল্টোতে উল্টোতে একটা পাতায় এসে থমকে যায় সে। কতগুলো লাইনের তলায় পেন্সিলের দাগ।

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন হয়েছে ভোর // মালা ছিল, তার ফুলগুলি গ্যাছে রয়েছে ডোর

নেই আর সেই চুপিচুপি চাওয়া// ধারে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া

চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে ঘুমের ঘোর// বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ বাহুতে মোর।

সিগারেটের আগুন আঙ্গুল পুড়িয়ে দেয় শুভেন্দুর। তাড়াতাড়ি আগুন নিভিয়ে সিগারেটটা ফেলে দেয় সে। কয়েক মুহূর্ত বসে থাকে চুপচাপ। তারপর আস্তে আস্তে বইটা তুলে নিয়ে পড়তে থাকে।

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর আগের মত// জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা জীবনহত

কে জানে কাননে ফুল ফোটে কিনা// আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা

কে জানে সে ফুল তোলে কিনা কেউ ভরি আঁচড়// কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কিনা সারা শহর।

শুভেন্দু বইটা বন্ধ করে সিঁড়ির ল্যান্ডিং এর দেয়ালে টাঙানো মার লালচে হয়ে যাওয়া ছবিটার সামনে এসে দাঁড়ায়। বিয়ের সময়ের ছবি। বেনারসী আর গয়নায় মাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

শুভেন্দু বলে – "মা গো, আজ তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।"

মা হাসছেন। শুভেন্দু প্রায় ফিসফিস করে যেন মায়ের কানে কানে বলছে এমনভাবে বলে – "তুমি যা পারোনি, তোমার ছেলের বৌ তাই পেরেছে। সংসারের লক্ষ্মণরেখাটাকে পার হয়ে গেছে অলি।"

--- সমাপ্ত ---

সুনন্দা বসু

আনন্দময়ী

রবীন্দ্রসাহিত্যের নারীচরিত্রের উজ্জ্বল তারকাদের সমারোহ থেকে শুধুমাত্র একজনকে বেছে নেয়া সহজসাধ্য নয় । মনে করুন সেইসব অনন্যা নারীচরিত্রের কথা – প্রত্যেকটি চরিত্রই তাদের স্বকীয়তায় সজীব ও সম্পূর্ণ । 'যোগাযোগের' কুমুদিনী, 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য অথবা 'চোখের বালি'র বিনোদিনী তাঁদের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, নারীসুলভ মাধুর্য্য এবং জটিলতা নিয়ে চিরকাল আমাদের আকর্ষণ করবে । এমনি অগণিত নারীচরিত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, গল্পে উপন্যাসে ভীড় করে আছে যাদের বৈশিষ্ট আমাকে আশ্চর্য্য করে । অবাক হয়ে ভাবি আজ থেকে শতাধিক বৎসর আগেই রবীন্দ্রনাথ নারীদের জন্য তাঁর লেখায় এতোটা জায়গা চিহ্নিত করে রেখেছিলেন – তাদের এক দরদি মন দিয়ে বুঝেছিলেন এবং নানারঙের তুলিতে চিত্রিত করে আমাদের উপহার দিয়েছিলেন এক একটি অসাধারণ, অবিস্মরণীয় চরিত্র ।

এই চরিত্রের মেলা থেকে যাঁকে আজ স্মরণ করছি তাঁর নাম আনন্দময়ী । 'গোরা' উপন্যাসের গোরা, ওরফে গৌরমোহন যাঁকে মা বলে জানে । এই উপন্যাসের নায়ক গোরা হলেও বস্তুত আনন্দময়ীকেই এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু বলে ভাবা যায় । তাঁর অতীতের একটি অসাধারণ সংকল্পই এই বাহিনীর ভিত । 'গোরা' উপন্যাসের পটভূমিকায় আছে সেই সময় যখন হিন্দুসমাজের গোঁড়ামি চূড়ান্তে পৌঁছানোর পর ব্রাহ্মসমাজের বুদ্ধিজীবি নেতৃবর্গ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন । সেই সমাজও ধীরে ধীরে নানা কুসংস্কার এবং সংকীর্ণতায় আক্রান্ত হয়েছে । গোরা প্রথমে কেশব সেনের বক্তৃতা শুনে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু পরে হিন্দুধর্মকেই ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম ধার্য্য করে তার মধ্যেই দেশের এবং দশের মুক্তির পথ খুঁজতে আরম্ভ করেছিল । সমস্ত শিক্ষিত সমাজ যেখানে ধর্ম এবং দেশভক্তির নানা বিরোধ ধর্মী আবর্ত্তে আন্দোলিত হ'চ্ছিল, তখন আনন্দময়ীকে আমরা এক অকম্পিত দীপশিখার মতো তাঁর বিশ্বাসে স্থির দেখি । গোরা বুঝতে পারতো না কেন তিনি এক ব্রাহ্মণ কন্যা হয়ে আচার বিচার মেনে চলতেন না । একথা সত্য যে বালিকা এবং কিশোরী অবস্থায় তিনি সমস্ত আচার বিচার মেনেই বড় হচ্ছিলেন । তাঁর স্বামী কৃষ্ণদয়াল বাবুই তাঁকে অন্যপথে নিয়ে আসেন । কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর সত্যদর্শনের ক্ষমতা তাঁর নিজেরই । তাই শত বাধা বিপত্তি এবং নিন্দা, কুৎসা তাঁকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করেনি ।

আমরা আনন্দময়ীকে প্রথম দেখি তাঁর গৃহে : তিনি ''ছিপছিপে পাতলা, আঁটসাঁটো .... মুখের বেড় অত্যন্ত সুকুমার .... হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় তাঁহার বয়স চল্লিশেরও কম .... শরীরের সমস্তই বাহুল্যবর্জিত । মুখে একটি পরিস্কার ও সতেজ বুদ্ধির ভাব সর্বদাই প্রকাশ পাইতেছে ।'' এই সতেজ বুদ্ধির পরিচয় আমরা তাঁর প্রতিটি কথা এবং কাজে নিরীক্ষণ করি । তাঁর জীবন কর্মময়, তাঁর হৃদয় সকলের জন্য উন্মুক্ত । তাই গোরা যখন হিন্দুধর্মের দোহাই দিয়ে তাঁর ''খৃষ্টান দাসী'' লছমিয়াকে বিদায় করতে বলে, তখন তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ দৃঢ়তায় সাথে তা করতে অস্বীকার করেন । এমনকি যখন গোরা বলে যে ''.... বিনু (অর্থাৎ বিনয়, গোরার প্রাণের বন্ধু, আনন্দময়ীর বিশেষ স্নেহের পাত্র) তোমার ঘরে খেতে পারে না'', তখনও তিনি তার সংকল্পে অনড় থেকেছেন – বলেছিলেন, ''আমি কিন্তু, বাছা, লছমিয়ার হাতে জল খাবো, সে আমি সবাই কে বলে রাখছি ।'' এই দৃঢ়তাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য; হৃদয়ের এই প্রসারতা নিয়েই তিনি সিপাহিবিদ্রোহের শিকার খৃষ্টান দম্পতীর অনাথ শিশু গোরাকে কোলে তুলে নেন তাঁর স্বামীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও । তখন তাঁর অল্প বয়স; তবু তাঁর স্বচ্ছ বুদ্ধি দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ... জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না ।'' যে রবীন্দ্রনাথের পিতামহী তার পিতামহের সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করেছিলেন কেবলমাত্র এই কারণেই যে তিনি ফিরিঙ্গিদের সাথে ওঠাবসা করেন, সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও উদারতায় বুঝতে পেরেছিলেন যে একমাত্র নারীদের দ্বারাই কুসংস্কারের মূলোৎপাটন সম্ভব । সেই বিশ্বাসই তিনি আনন্দময়ীর মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন ।

আনন্দময়ীকে বুঝতে গোরার সময় লেগেছে। কিন্তু বিনয় প্রথম থেকেই তার ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য আনন্দময়ীকে বিনা দ্বিধায় অর্পণ করে আসছে। বিনয় মাতৃহারা; কিন্তু আনন্দময়ী তাকে নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করেন – মায়ের অভাব সে কখনো অনুভব করেনি। তার জীবনে আনন্দময়ী এক অপরিহার্য্য উপস্থিতি। তাই গোরার নির্দেশে তাঁর ঘরে না খাওয়া সে মেনে নিতে পারেনি। গোরার বন্ধুত্বও তার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান – তার নির্দেশ অমান্য করে তার বিরাগভাজন হওয়াও তার কাছে দুঃসাধ্য। পরে যখন সে ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে ললিতার প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন গোরার দিক থেকে প্রবল আপত্তি আসে এবং সে গোরার বৈমাত্রেয় ভাই- এর মেয়ে শশীমুখীকে বিবাহ করতে রাজী হয়। এর ফলে তার অন্তরে যে ব্যথার ভার তাকে দহন করছিল আনন্দময়ীর সূক্ষদৃষ্টিতে তা সহজেই ধরা পড়ে। এমন এক 'সুনিপুণ মাঝির মতো' তিনি তার সাথে কথোপকথন পরিচালনা করেন যে বিনয় তার হৃদয়ের কথা নিঃসংকোচে তাঁর কাছে প্রকাশ করে। বিনয়ের জীবনে যখনই কোন দ্বিধা ও সংশয় উপস্থিত হয়েছে সে তখন আনন্দময়ীকেই স্মরণ করেছে। বলেছে, ''এই মুখের স্নেহদীপ্তি আমাকে আমার সমস্ত মনের বিক্ষেপ হইতে রক্ষা করুক। এই মুখেই আমার মাতৃভূমির প্রতিমাস্বরূপ হউক, আমাকে কর্তব্যে প্রেরণ করুক।''

আনন্দময়ীর স্নেহধারা সকলের উপরই বর্ষিত হয়েছে। যারা খোলা দৃষ্টি এবং অন্তর নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে তাদের কাছে তাঁর স্বরূপ আপনিই প্রকাশ পেয়েছে। তাই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিতা সুচরিতাকে দেখি সহজেই তাঁর আপনজন হয়ে উঠতে। যে ললিতা 'হিঁদুবাড়ী'-র মেয়েদের আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত নয় বলে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত, সেও আনন্দময়ীর মুখের কথা শুনে বিস্মিত হয়েছে। আনন্দময়ীর যখন চরম দুঃখের সময়, গোরার কারাদন্ড হয়েছে তখনও তিনি তাঁর সংযম ত্যাগ করেননি। রবীন্দ্রনাথের কথায়, ''আনন্দময়ী কাহারো সান্ত্বনাবাক্যের কোন অপেক্ষা রাখিতেন না; তাঁহার যে দুঃখের কোন প্রতিবাদ নাই, সে দুঃখ লইয়া অন্য লোক তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে আসিলে তাঁহার প্রকৃতি সংকুচিত হইয়া উঠিত।'' তাঁকে সে সময় দেখে ললিতার উক্তি ''যেমন বল, তেমনি শান্তি, তেমনি আশ্চর্য সদ্‌বিবেচনা'' সম্পূর্ণভাবে তাঁর চরিত্রকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে।

আনন্দময়ী রবীন্দ্রনাথের এক অসাধারণ নারীচরিত্র। আজও আমরা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করি। নারীর সমানাধিকার নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র লড়াই চলছে এখনো। মানুষের কুসংস্কার শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও। আজ থেকে শতাধিক বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধ মর্যাদায় এক গৃহবধূর প্রবল বিশ্বাস আর সংস্কারমুক্ত বিচার বিবেচনা তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের উপসংহারে গোরা তাই বলছে, ''মা, তুমিই আমার মা, যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই – শুধু তুমিই আমার কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।''

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

"প্রিয় সখা হে"

সেই দুঃস্বপ্নের দিন কী একেবারেই শেষ হল ? আশা হয়, তবে ভরসার সাহস নেই।

একটা একটা করে দিন কাটছিল তখন। ঘরে বাইরে এক দুঃসহ দিনযাপন। সেই নিদারুণ বিভীষিকার দিনে বসেছিলাম সঞ্চয়িতা খুলে। চোখে পড়ল কয়েকটি লাইন। কী জানি কবে, দুঃখের দাবদাহ সইতে সইতে কবি লিখেছিলেন,

"দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে / এসেছে আমার দ্বারে;" তার কিছু পরেই আবার দেখি দুঃখের মাঝে অবিচল তিনি। ভয়-ভীতি হীন। বলছেন,

"যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস / ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।"

তখন আমাদেরও দিন কাটছে একটি একটি করে। লকডাউনের মধ্যে করোনার আতঙ্কে কাটানো দিনেরাতে কবির একটি গান যেন বুকের মধ্যে মন্ত্রের মত বাজছে। চারিদিকে ছেয়ে আসা অন্ধকারের মাঝে, পিদিমের শিখার মত অনির্বাণ বিশ্বাসের তরণী বেয়ে চলেছে মনমাঝি, আর বিশ্বচরাচরে ধ্বনিত হচ্ছে,

"ভয় হতে তব অভয় মাঝে / নূতন জীবনও দাও হে।" গানটি গাইছিলাম, একান্ত ভাবে নিজের জন্য, নিজের মনকে সাহস যোগাতে। কবিরা ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা হন, তাঁরা এই অনিত্য জীবনেও সুন্দরের সাধনায় অকুতোভয় থাকেন। তারা জীবনের মূলমন্ত্রটি জানেন যে।

"মুক্ত করো ভয় / আপনা মাঝে শক্তি ধরো / নিজেরে করো জয়।"

# # #

শুরু হয়েছিল কিছুদিন আগেই, তেমন সাড়াশব্দ ওঠেনি। আজ থেকে দুবছর আগের কথা বলছি। দুহাজার কুড়ির মার্চমাসে ঘূর্ণিঝড়ের মত মৃত্যুর তান্ডবে ধেয়ে এলো সেই ভয়ংকর মহামারী। গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহের সঙ্গে মিল রেখেই শুরু হয়েছিল মহাকালের তাথৈ নৃত্য, মৃত্যুর মহাধ্বংসলীলা। তবু তারই মাঝে বারবার মনে পড়েছে কবির সেই আশ্বাসবাণী,

"যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, / সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া, / যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে, / যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া, / মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে, / দিক-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা- / তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, / এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।"

আশায় বুকবেঁধে ঘরে ঘরে, পথে পথে মানুষ কী বুকের মধ্যে অহরহ নিজের ভাষায়, নিজের বাণীতে এই শব্দগুলোই উচ্চারণ করেনি ? নৈরাশ্যে ডুবে যেও না, আশা রাখো। যদি পারে আশাই পারবে, আশাই বাঁচাবে।

"এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।"

সেই সময় হয়ত পার করেছি আমরা। তবু ভয় যায়নি। সারা বিশ্বের দিকে তাকালে দেখব, সংশয় কাটেনি। আকাশের কোণে কালোমেঘের টুকরো দেখে মাঝি যেমন ভয় পায়, প্রস্তুত হয়ে থাকে। সর্বদা তার হাওয়ায় ভাসা সাদা

পালের গোটানোর প্রস্তুতি রাখে নিজের মুঠোর বন্ধনীতে, ঠিক তেমন করে অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত হয়ে আছি আমরা। আর মনে মনে জপছি কবির অভয়মন্ত্র,

"বিপদে আমি না যেন করি ভয়।"

মাঝে মাঝে মনে হয় এসবের মাঝেই এসে দাঁড়ান তিনি, না দেখা সেই জীবনদেবতা।

# # #

মহামারীর প্রকোপ কমতে না কমতেই আবার দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো বিশ্বের এককোণায়, আমাদের একেবারে নিকট প্রতিবেশী আফগানিস্থানের আকাশে। এক দেশ থেকে অন্য দেশ, এক জাতি থেকে অন্য জাতি। মিল শুধু এক জায়গায়, সঙ্কটে, মানুষের ওপর নেমে আসা দুর্দৈবের সর্বনাশা খেলায়। দুঃসময় বুঝি আমাদের পিছু ছাড়বে না।

তালিবানদের আতঙ্কে আফগানিস্থানে দলে দলে গৃহহীন, পরবাসী হল মানুষ। মেয়েরা আবার অন্দরবাসী হল। তাদের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে ভেঙেচুরে নস্যাৎ করে দেবার ফতোয়া উঠল দিকে বিদিকে। অন্তঃপুরের বন্ধ ভারী দরজার পেছনের কালো অন্ধকারে তাদের নির্বাসনের দিন বুঝি ফিরে এলো আবার। বারবার প্রার্থনা করছিলাম, হে পরম মঙ্গলময়,

"জীবনও যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো।"

আর ঠিক সেই সময়ে আমার মনে পড়ল কবির সেই গান।

"না বাঁচাবে আমায় যদি মারবে কেন তবে ? / কিসের তরে এই আয়োজন এমন কলরবে ?"

তখন বারবার মনে হয়েছিল নারী জন্মের এই আয়োজন কিসের জন্য ? প্রকৃতি আর নারী একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ তো। এই মরণশীল ক্ষণিকের জীবনযাত্রায় মায়া মমতার স্বপ্নজাল নারীই তো রচনা করেছে যুগ যুগ ধরে। জীবনের চক্রবৎ ঘূর্ণিপাকে কেন বারবার তাকেই হতে হবে লাঞ্ছিত, অপমানিত ? সেই ভাবনা, সেই ক্ষোভ শুনলাম কবির কণ্ঠস্বরে।

"নারীকে আপনভাগ্য জয় করিবার / কেন নাহি দিবে অধিকার, / হে বিধাতা ?"

ফিরে ফিরে দেখা ইতিহাসের পাতা মনে করিয়ে দিয়েছিল তালিবান জমানার সেই দুঃসহ সময়কালের কথা। সৈয়দ মুজতবা আলির লেখায় কাবুলের কথা পড়েছি। তারও আগে পড়েছি কবির লেখা মিনি আর কাবুলিওয়ালার গল্পে। পড়তে পড়তে পরিবার বিচ্ছিন্ন সেই কাবুলের মানুষটির সঙ্গে গড়ে উঠেছিল হৃদয়ের অচ্ছেদ্য বন্ধন। হোসেনির লেখায় তালিবান জমানায় মানুষের ওপর মানুষের আক্রমণের, অত্যাচারের বিবরণ পড়ে শিউরে উঠেছি। সেদিনের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা ছিলনা কোন। তবু নিয়তির অনিবার্য অঙ্গুলিহেলনে তাই সত্য হল। ফিরে এলো অত্যাচারের, অন্ধকারের সেই নিকষ কালো দিন।

নিদান পেতে সান্ত্বনা পেতে, ফিরেছিলেম তাঁর কাছে। পথ হারা স্বজন হারা মানুষের কে হবে দুঃখের সঙ্গী, কে দেবে সান্ত্বনা একান্ত সেই মানুষটি ছাড়া ? সেদিন তাকে বলেছিলেম তারই বাণী সম্বল করে।

"যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম ভুলিয়ে দিল তারে, / আবার কোথা চলতে হবে গভীর অন্ধকারে। / বুঝি বা এই বজ্ররবে নতুন পথের বার্তা কবে- / কোন পুরীতে গিয়ে তবে প্রভাত হবে রাতি।"

মনে মনে টের পেলেম, তিনি বলছেন, শান্ত মনে, বিশ্বাসে আর আশায় ভর করে এগিয়ে চলার কথা।

"এই-যে আমার ব্যথার খনি জোগাবে ওই মুকুট-মণি।"

# # #

কিন্তু "শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?"

আবার বেজে উঠল যুদ্ধের রণদুন্দুভি। ইউক্রেনের, রাশিয়ার, শিশু মহিলাদের স্বজনহীন ছবি আঁকা হতে লাগল ধুলো ধোঁওয়া বারুদের ধূসর চিত্রপটে। এমনটাও তো কল্পনায় ছিলনা।

কিন্তু কবি সত্যদ্রষ্টা, তিনি অনাগত ভবিষ্যতের কথা লিখে যান অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে।

"দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন, / ওরে উদাসীন- / ওই ক্রন্দনের কলরোল, / লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।"

আজ যখন মানবিকতার পতন দেখি, সহমর্মিতার মায়া মমতার গভীর বাঁধন কাটিয়ে হিংস্র উল্লাসে শ্বাপদের মত মেতে উঠতে দেখি মানুষ নামের সভ্য জাতিটিকে, মানুষের হাতে মানুষের হত্যা, সর্বনাশের ভারা পূর্ণ হতে দেখি, শুনতে পাই কবি বলছেন,

"পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা / আর চলিবে না / বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি, / কান্ডারি ডাকিছে তাই বুঝি- / তুফানের মাঝখানে / নূতন সমুদ্রতীরপানে / দিতে হবে পাড়ি।"/

সেই নূতন সমুদ্রতীরের আভাস আসে বারেবারে তার লেখায়, তার গানে, কবিতায়। আমাদের চোখ আছে, দৃষ্টি নেই। কান আছে, যথার্থ শ্রবণশক্তি নেই। চারিপাশের হলাহলে ডুবে যাই বারবার। তার কাছে আবার নতজানু হই। তিনিই তো আমার অসময়ের আশ্রয়। প্রার্থনা জানাই সবরকমের দুঃখ কষ্টের হাত থেকে মানুষের মুক্তির জন্য। একান্তে বলি,

"প্রিয়সখা হে, ছেড়ো না ছেড়ো না মোরে ..."

# # #

শুভ্র দত্ত

রবিদাদুর জন্মদিন

সায়েন্সের হোমওয়ার্কটা খুব বোরিং । যাক, লোডশেডিং হওয়ার আগেই শেষ করে ফেলেছি । চটপট খাতাটা স্কুলব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললাম । এখন বাকি রইল শুধু অঙ্ক ।

দেয়ালের ঘড়িতে দেখলাম সাতটা পঁচিশ । মা'র মোবাইল ফোনটা অন করে দেখলাম সাতটা ছাব্বিশ । মাত্র ক'মিনিট বাকি । বাবা তো এখনো অফিস থেকে এলোনা দেখছি ।

আজকে নাকি কমিউনিটি হলে জরুরী মিটিং আছে; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১ তম জন্মদিনে কি করা যায় তাই নিয়ে আলোচনা হবে । বাবার সাথে আমিও যাবো ভাবছিলাম । আমার এবছরে ডবোল ডিজিট বয়স হয়েছে, জরুরী ব্যাপারগুলো আমারও জানা দরকার ।

মা এক্ষুনি টিভি বন্ধ করে রান্নাঘরে গেল । আমার মাথায় একটা মতলব এল । চট করে স্যান্ডেল পরে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম । বাবার তো দেখা নেই, আমি নিজেই নাহয় মিটিংটায় ঘুরে আসি ।

এই কমপ্লেক্সের কমিউনিটি হলটা আমাদের বিল্ডিং এর একতলায় । সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে মনে পড়ল গতকাল অঙ্কে হোমওয়ার্ক দিয়েছে — এসক্যালেটর আর লিফট কত স্পীডে একতলা থেকে পাঁচতলায় উঠতে পারে সেই বিষয়ে । বাবা দেখে বললো, 'আমাদের সময়ে ছিল সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্ক । তোদের কালে বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি ।'

তোমাদেরও আগের কালে কি অঙ্ক ছিলো বাবা ? — আমার জানতে কৌতূহল হলো ।

বাবা বললো, 'তখন তৈলাক্ত বাঁশে ওঠার অঙ্ক করতে হতো । খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার, সেইজন্য মানুষকে না দিয়ে বাঁদরকে সেই বাঁশে উঠতে দেওয়া হতো । তারাও খুব ভালো পারতো না এবং কিছুক্ষণ বাদে বাদেই পিছলে একটু করে নেমে আসতো ।'

যাইহোক, নিচে এসে দেখলাম কমিউনিটি হলে টেবিল বোর্ডের চারধারে চেয়ার পেতে কয়েকজন কাকু আর মাসি বসে আছে । স্যানালকাকু আমাকে দেখে বললো, 'কি ভুটকু, পিংপং খেলতে এসেছো নাকি ? আজ তো খেলা বন্ধ ।'

'মিটিং এ এসেছি', বললাম আমি, 'বাবার বদলে'; বলে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম । চেয়ারটা উঁচু আর আমার পা গুলো মাটিতে পৌঁছয় না, তাই বসে বসে পা দোলাতে লাগলাম । তারপর মিটিং জিনিসটা শুরু হল । দেবুকাকু মানে রনির বাবা বললেন যে এবারে যেহেতু আমাদের প্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী সেহেতু আমাদের অনুষ্ঠানে একটু কিছু বিশেষত্ব থাকা উচিৎ । তাতে সায় দিয়ে স্বপ্নামাসি মানে টিনির মা বললেন যে এমন কিছু করতে হবে যা আগে কখনো করা হয়নি । কথাটা মনে হয় সকলেরই পছন্দ হলো ।

এবারে আমি হাত তুললাম । তারপরে একটু কেশে গলা ঝেড়ে নিয়ে (এটা সাহা-জ্যেঠুর কাছে শিখেছি; এতে বক্তব্যের ওজন বাড়ে) বললাম — 'এই বিশেষ জন্মদিনে একটা বিশেষ ভাল এবং বড় কেক তৈরী করাতে হবে; তার সঙ্গে রঙিন (মাল্টিকালার হলে ভাল হয়) ১৬১ টা ক্যান্ডেল । তাছাড়া বেলুন-টেলুন তো থাকবেই ।'

ওপাশ থেকে মিমির বাবা বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের আমলে তো কেক, ক্যান্ডেল, বেলুন এসবের চল ছিল না —'

আমি বললাম, 'যারা ওরকম খুঁতখুঁতে তাদের জন্য পুলিপিঠে, পাটিসাপটা, পায়েস এইসবও থাকবে । আর থাকবে

কিছু তেলের প্রদীপ। এইবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে জোরে ফুঁ দিয়ে একবারে ওই সবকটা মোমবাতি আর প্রদীপ নিভিয়ে তারপরে কেক কাটবেন।'

এটা শুনে সকলেই একটু উত্তেজিত আর উৎসাহিত হয়ে নড়েচড়ে বসলেন। ঘোষকাকু বললেন, কিন্তু মুশকিলটা কি জানো অর্পণ, রবিবাবু তো গত হয়েছেন গত শতাব্দীতে। কেক্ কাটার জন্য ওনাকে এখানে আনা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না'।

কিছু কিছু লোক আছে যারা এভাবে সব ভালো ভালো প্রস্তাব আর প্রচেষ্টা ভন্ডুল করে দিতে চায়। কিন্তু আমিও কম যাই না। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, 'ক্রীসমাসে যদি সান্তা ক্লস ভুঁড়ি ফুলিয়ে দাড়ি দুলিয়ে এসে শপিং সেন্টারে এসে উপস্থিত হতে পারে, তাহলে রবীন্দ্রনাথের আসা সম্ভব নয় কেন ?'

শুনে সকলে দেখলাম একটু চিন্তায় পড়ে গেছেন। তখন আবার আমিই সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব নিলাম। বললাম, 'আমি আমার রাঙাদাদুকে বলে দেখতে পারি রবীন্দ্রনাথ হওয়ার জন্য। রাঙাদাদুর মাথায় অবশ্য টাক আছে; তা একটা পরচুলা পরিয়ে দিলেই চলবে। কিন্তু ওনার দাড়িটা মোটামুটি ঠিকঠাক; পরদাড়ি আর লাগবে না।'

ঘোষকাকু আমাকে প্রশ্ন করলেন যে রাঙাদাদু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারবেন কিনা। উত্তরে আমি জানালাম যে রাঙাদাদু খুবই উৎসাহে গান গেয়ে থাকেন, তবে ওনার বাড়ির সকলের মতে সেগুলো গান না বলে সুরেলা কবিতা বলা উচিত।

শুনে সান্যালকাকু বললেন, 'আমার মামাশ্বশুর অমিয়বাবু —' স্বপ্নামাসি বললেন, 'আমার বন্ধু সোমার দাদু —'। দেবকাকু বললেন, 'আমাদের জামাইবাবুর পিসেমশাই —'; ইত্যাদি। তাতে বেশ গোলমাল বেধে উঠলো। অনেক ক্যান্ডিডেট।

কিন্তু শেষপর্যন্ত আলোচনায় দেখা গেল তাঁরা কেউই এই কাজের জন্য নিখুঁত উপযুক্ত নন। যাঁর নাকমুখ ঠিক রবিঠাকুরের মতো তাঁর হাইটটা বড্ড কম। যাঁর চেহারাটা মানাবে ভালো তাঁর আবৃত্তি ও গানের গলা খুব খারাপ। সান্যালকাকুর মামাশ্বশুর অমিয়বাবু সব দিক দিয়ে প্রায় পারফেক্ট ছিলেন, কিন্তু তিনি নাকি ভারি হাঁপানিতে ভোগেন। স্বপ্নামাসি বললেন, এতগুলো বাতি ফুঁ দিয়ে নেভাতে হলে সেখানেই ওনার নাকি 'বাইশে শ্রাবণ' হয়ে যাবে।

এই পর্যন্ত মিটিংটা ভালই চলছিল। এমন সময়তে দেখলাম কমিউনিটি হলের দরজা দিয়ে বাবার নাকটা, চশমাটা, তারপরে পুরোটাই ঘরে ঢুকে এলো।

আমি সোজা মিটিং ছেড়ে ওপরে দৌড় মারলাম। অঙ্কের হোমওয়ার্কটা তো করাই হয়নি এখনো।

মৌসুমী রায়

বর্ষা ও বনস্পতি

বাংলা বছরের প্রথম মাস বাঙালির সূর্যোদয়ের মাস। আমাদের প্রাণের ঠাকুর বরণের মাস এই বৈশাখ। ২৫শে বৈশাখ জন্মসংখ্যার কারণে তাঁর কথা লিখতে বসে ওনার বিপুল সৃষ্টিভান্ডার হাতড়ে চলেছি অনবরত। থৈ পাওয়া ভার ! রবি ঠাকুরের কথা উঠলেই বহুকিছু মনের সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। কোনটাকে যে আগে রাখি বোঝা দায় ! তাই মানুষ রবি ঠাকুরের কিছু ভালোলাগার বিষয় নিয়ে আজ কথা বলবো ভেবেছি।

প্রকৃতির সাথে কবিগুরুর ছিলো এক নিবিড় আত্মিক বন্ধন। সবুজ অরণ্যের সৌন্দর্যের কাছে তিনি ছিলেন আত্মনিবেদিত। বৃক্ষরাজির ছায়াঘন শীতল স্পর্শ তাঁকে অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দিতো। ছোটো চারাগাছকেও তিনি তাঁর আশ্রমে সযত্নে লালন করতেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহকে আড়াল করে রাখা বনস্পতি যখন বর্ষার আগমনে শরীর ভিজিয়ে স্নিগ্ধ হয়ে উঠতো সেই দৃশ্য কবিগুরুকে উদ্বেলিত করে তুলতো। বৃষ্টির কোমল ছোঁয়ায় এক অপরূপ রোমান্টিকতায় ভরে উঠতো তাঁর শরীর-মন। আকাশের সাথে দীর্ঘ অদেখার পর যখন অভিমানী ঘনকালো মেঘ ছেয়ে যেত আকাশের বুকে কবিগুরুর কলম তার সেই রূপ বর্ণনা করেছেন নানা আঙ্গিকে। গানে কবিতায় তাকে বরণ করে কখনো লিখেছেন, "এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে / এসো করো স্নান নবধারা জলে"। আবার কোনো এক বর্ষামুখর দিনে তাঁর কলম থেকে ঝরে পড়েছে তাকে ছুঁয়ে দেখার আকুতি ... "আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে / জানিনে জানিনে কিছুতে কেন যে মন লাগেনা"।

বৃষ্টির সাথে গাছগাছালির পারস্পরিক যোগাযোগ তাঁর কবিমনে এক অনাবিল খুশির সঞ্চার ঘটাতো। শান্তিনিকেতনে আশ্রমের আশেপাশে মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো বীজ বর্ষার জল পেয়ে অঙ্কুরিত হয়ে যখন জন্ম হতো কচি কিশলয়ের, কবি আহ্লাদিত হতেন প্রকৃতির এই অপূর্ব সৃষ্টিতে। নানাভাবে তাঁর ভাবনায় উঠে আসতো সেই রূপের বর্ণনা। চাইতেন আশ্রমের চারিপাশ ভরে উঠুক গাছগাছালি বৃক্ষরাজিতে। প্রকৃতির সেই প্রাণের স্পন্দন তিনি ছুঁতে পারতেন তাঁর অনুভবে। গাছ ছাঁটা বা ডালপালা কাটা হলে মনে ভীষণ ব্যথা পেতেন। বোলপুরে তাঁর "কোনার্ক" ঘরের পাশে বর্ষাশেষে এক শিমুল আপন খেয়ালে বেড়ে উঠেছিলো। গুরুদেবের সে কী যত্ন তাকে ঘিরে ! ভবিষ্যতে সেটি বড়ো হলে ঝড়ে বা অতিবর্ষণে ভেঙে পড়ে ঘরের ছাদ বা বারান্দার ক্ষতি হতে পারে ভেবে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ সেটিকে কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। কবিগুরু আহত হন ছেলের সেই সিদ্ধান্তে। রথীন বিরত হন। রবীন্দ্রনাথ তাতে ভারি খুশি হয়ে পাশে গজিয়ে ওঠা এক মালতীলতার লতানে কচি ডালকে পরম স্নেহে জড়িয়ে দেন সেই কিশোর শিমুলের গায়ে। যাতে তার অভিভাবকত্বে বেড়ে উঠতে পারে ওই শীর্ণকায়া মালতীলতা। রবি ঠাকুরের প্রেমসত্ত্বা সেই শিশু কিশোরের একত্রে মিলেমিশে বড় হওয়া উপভোগ করতো দুচোখ ভরে। সেই শিমুল একদিন মাটির গভীরে শেকড় বিস্তার করে মহীরুহ হয়ে উঠে ঢেকে ফেলে অনেকটা আকাশ। তার সেই শান্ত ছায়াতলে রবি ঠাকুর এসে বসতেন অবসরে। বৃষ্টির মরশুমে সবুজ পাতার আড়ালে দেখতেন মেঘেদের লুকোচুরি। শিমুলের ফুলে ভরে থাকতো বৃক্ষতল। বীজ ফেটে সাদা তুলো হাওয়ায় ভেসে বেড়াতো এদিক থেকে ওদিক। শ্বেতশুভ্র মালতী ফুল লালমাটির দেশে সাদা কার্পেট বিছিয়ে দিতো চারিপাশে কবিগুরুর চরণ স্পর্শের প্রতীক্ষায়। সেও যেন এতোকাল তার মাটি আঁকড়ে বেঁচেবর্তে থাকার ঋণ চোকাতে ব্যস্ত। বসন্তে যে রঙের আবির্ভাব বর্ষার জলসিঞ্চনে সেই প্রেম সেই মহিমা বিকশিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে গুরুদেবের কলম ছুঁয়ে। বর্ষার রূপ বর্ণনায় তাঁর যেন ছিলো পরম সুখ। প্রবল বর্ষণে নদীকূল ছাপিয়ে গ্রাম ভেসে যাওয়ার কথাও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত হতো তাঁর লেখনীতে। উঠে আসতো মানুষের দুর্দশার কথা অসহায়তার কথা। তবু প্রকৃতির এই সজল স্নিগ্ধ সবুজ পরিবেশ দিশেহারা করে তুলতো তাঁর লেখক সত্ত্বাকে। জীবনের শুরুতেই তাই কোনো এক

শ্রাবণদিনে কিশোর কবি লিখে ফেলেছিলেন, "শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশিথ যামিনী রে"। আবার সেই একই রূপ তাঁর পরিণত বয়সের আবেগে ফুটে ওঠে "নীল অঞ্জন ঘন কুঞ্জ ছায়ায় সম্বিত অম্বর / হে গম্ভীর হে গম্ভীর"।

বৃষ্টিমেদুর মেঘলা আকাশে ঢাকা সবুজ বনবীথির প্রতি ওনার নিবিষ্ট ভালোবাসা যেন নির্ভরতা খুঁজে পেতো। পলাশ শিমুলের সাথে নানা ছোটো বড়ো তরু-বৃক্ষ তাঁর প্রশ্রয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেড়ে উঠেছিলো আশ্রম প্রাঙ্গণ ঘিরে। খোয়াই এর ধারে রবির শান্তিনিকেতনে তাদের ছিলো অপার শান্তির আশ্রয়। এই প্রকৃতি প্রেম ও তার সান্নিধ্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও যাতে সঞ্চারিত হয়, ছাতিম তলায় গাছের ছায়ায় বিশ্বভারতীর পঠনপাঠনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল তাঁরই উদ্যোগে। শেষের দিকে বয়সের ভারে জীর্ণ শরীরে তিনি জানলার ধারে বসে গাছেদের সাথে ভাব বিনিময় করতেন। হাওয়ার দোলায় পাতার নড়ে ওঠার প্রতিটি ভাষা যেন বুঝতে পারতেন। জানলার সামনের রাস্তায় মানুষের চলাচল বা কর্মব্যস্ততায় তাঁর তেমন কোনো আগ্রহ ছিলো না তখন। তিনি গল্পে মশগুল থাকতেন জানলার বাইরের বটবৃক্ষটির সাথে। তাঁর ছোটোগল্প "প্রাণমন" এ বনস্পতির প্রতি সেই ব্যাকুলতারই চিত্র ফুটে ওঠে লেখার ছত্রে ছত্রে। বসন্তে কচি পাতার ফাঁকতাল গলে আলো আঁধারে যে মায়াজাল বুনে চলে বর্ষার জল পেয়ে তারই পরিণত রূপ মুগ্ধ করে তুলতো কবিগুরুকে। তাঁর কথায়, বর্ষাস্নাত বৃক্ষের ঘন পল্লবিত রূপ প্রৌঢ়ের পাকা বুদ্ধির মত। কোনো ফাঁক ছিলোনা তাতে। অরণ্যের প্রতিটি প্রাণ যেন এক একজন অমোঘ শিল্পী। তারা নিজ অঙ্গেই নানা আকৃতি খোদাই করে। ফুল ফল পাতাকে রঙে রসে গন্ধে ভরিয়ে তোলে তার নিজস্ব শিল্পসুষমায়। প্রকৃতির প্রতি তাঁর এই আত্মিক টান থেকেই হয়তো জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এসে তিনি মন দিয়ে ফেলেছিলেন মংপুর শাল পাইনের জঙ্গলঘেরা পাহাড়ি নির্জনতাকে। যেখানে অল্প কথায় মেঘ করে বৃষ্টি নামে ইচ্ছে মতন।

স্নিগ্ধা সেন

চিরসখা

গান, কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, প্রহসন ... রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টি সম্ভারের কোনটি আমাকে এ যাবৎ সব চেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে অনেকবার। তবে প্রশ্ন যাঁরা করেন তাঁরা প্রায়শঃ নিজের পছন্দমত উত্তর ধরে নেন আমাকে ভাববার অবকাশ না দিয়ে।

ভাবতে গেলে পড়তে হয় অকূল সাগরে। রবীন্দ্রনাথকে চিনি সেই "শিশু" বইটি হাতে পাবার দিন থেকে, – হয়তো বা সেই সাদাকালো কাগজ কাটা ছবির মত ইলাস্ট্রেশন ওয়ালা "সহজপাঠ" এর পাতা উল্টোতে উল্টোতে। ছবি আর ছন্দ শিশুমনকে টানে সর্বপ্রথম। "খুকী তোমার বড্ডো ছেলেমানুষ", "পোড়ো মোর বেড়াল ছানাটি" বা "হারিয়ে গেছি আমি" – কবিতার লাইনগুলি আমার মনে ছবি আঁকতে থাকত। আমি নিজেও ছিলাম নিঃসঙ্গ এক শিশু, – তাই গুরুমশাই হয়ে বেড়ালছানা, নিদেনপক্ষে শালিক চড়াইকে লাঠি দুলিয়ে শাসন করবার একটা মঞ্চদৃশ্যে নিজেকে বসিয়ে দুপুর কাটিয়ে দিতাম অনায়াসে। অন্ধকারে মনে পড়ত বামীকে, ভয় হত আমিও বুঝি হারিয়ে গেলাম। আর ছাদের উপর জলের ট্যাঙ্কের ধারে লুকিয়ে বসে এই ই আমার রাজার বাড়ি ভাববার কল্পনাবিলাস তো রবীন্দ্রনাথের কাছেই শেখা। কথা দিয়ে আঁকা চলমান এমন সব ছবি দিয়ে তৈরি হয়ে উঠছিল সেই বয়েসে আমার একান্ত আপন একটা জগৎ।

আমাদের বাঙ্গালী জীবনে শ্বাসে প্রশ্বাসে রবীন্দ্রনাথ। ক্রমে ছন্দছবি'র সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে মনের মধ্যে জায়গা করে নিচ্ছিল সুর। সে সুর সহজে গলায় উঠে আসত, প্রাত্যহিকতার অভ্যাসে ঢুকে পড়ে। স্কুলে প্রেয়ারে "আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ" গেয়ে সংসার কাজে অর্থাৎ ক্লাসে বসে পড়া প্রায় যান্ত্রিক নিয়মে চলত। গানের ক্লাসে মাস্টারমশাই বসতেন এস্রাজ কোলে করে, আমরা কোরাসে গাইতাম "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে" শীতটা যায় যায় এমন সময়ে। মন দিয়ে শিখতাম কারণ স্কুলের বার্ষিক উৎসবে ওই গানের সঙ্গে নাচ আমাদের ক্লাসের জন্য ধরা রয়েছে।

ওই বয়সে স্কুলের অনুষ্ঠানে সুযোগ পাওয়ার গৌরব ছিল বিরাট। কি করে নির্বাচন করা হত ? কেন ? আন্তঃ ক্লাস সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হতো। ভারি তালের ব্রহ্মসঙ্গীত বা লোকসঙ্গীতের সুরাশ্রিত রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারলে বিচারকেরা খুব খুশি হতেন। ব্যস ! রবীন্দ্র নাথের এত গান আছে আর যে অনুষ্ঠানের জন্যই হোক না কেন উপযুক্ত গানের অভাব নেই। বছরভর আমরা কত গানই যে শিখতাম আর আনন্দে গাইতাম তার ইয়ত্তা নেই।

এর পরের পর্যায়ে আমাদের টানল রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য আর নৃত্যনাট্য। নানা ভাব আবেগের ওঠাপড়ার নাটক নিজেদের ভেতরে চলছে তখন একটু আধটু। নজর ছড়িয়ে পড়ছে কবিতা ছোটগল্পের দিকে। নিজেদের যেন আবিষ্কার করছি ধীরে ধীরে রবীন্দ্রসাহিত্যের দর্পণে। নিছক আনন্দ পাওয়ার পাশেপাশে বিচার করবার, বিশ্লেষণের আর রসিক সুলভ মতামত প্রকাশের আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠছে। পাঠ্যক্রমের বাইরে কবিতা যা পড়ছি তাকে যাচাই করছি রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে তুলনা করে। রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চাতেও এই প্রবণতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কোন বিশেষ গায়ক বা গায়িকার গায়নভঙ্গী অনুসরণ করছি। নিজেরা রবীন্দ্ররচিত গানকবিতা সাজিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছি। ওটাই আমাদের সোচ্চার বাঙ্গালিয়ানা তখন।

আধুনিক সাহিত্যিক গোষ্ঠী তখন রবীন্দ্রনাথকে খানিকটা ভরসা করে খানিকটা বিরোধিতা করে নতুন পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত রয়েছে স্বরলিপিবিশ্বস্ত। বরং গবেষণা চলছে গানগুলির রচনাকাল এবং কোন ঘটনার সঙ্গে কোন গানের যোগ রয়েছে বা গীতবিতানের বিভিন্ন পর্যায়ে একই গান সামান্য পাঠভেদে রাখা হয়েছে কেন ইত্যাদি নিয়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বৌদ্ধিক চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে একটু বেশিরকম রক্ষণশীল হয়ে পড়ছিলেন গোঁড়া রবীন্দ্রানুরাগীরা। গাইবার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানবিশেষের আধিপত্য গুণী গায়কের স্বাভাবিক সঙ্গীতবোধের উপর শাসনের বেড়ি পরাতে চাইলে প্রতিবাদ এবং সংরক্ষণ বাদের দ্বন্দ চলেছিল মাসের পর মাস।

গানের ক্ষেত্রেও নতুন ভাবনাকে আটকানো গেল না রবীন্দ্ররচনার কপিরাইটের কাল শেষ হবার পর। হালকা হলুদ রঙের বিশ্বভারতী প্রকাশনার পাশাপাশি বাজারে এসে গেল অন্য চেহারার গীতবিতান, এমন কি অন্য কোন প্রকাশনার জমকালো মলাটের স্বরবিতান সংগ্রহ ও বইএর দোকানের তাকে জায়গা নিল। ব্যান্ডের গান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। ফিউশন নামে একটি পাঁচমিশেলী গীতিরূপ গীতিকার গায়কেরা শ্রোতাদের সামনে এনে ফেলেছেন। এই ফিউশন ধারায় রবীন্দ্রসঙ্গীতকে নানাভাবে নানাছন্দে নানা যন্ত্র সহযোগে এবং কখনো বা অন্য ধরণের গানের সঙ্গে মিশিয়ে গেয়ে প্রবল জনসমর্থন যেমন মিলেছিল, আবার বিরূপ সমালোচনারও একটা তুফান তোলা হল। রবীন্দ্রসঙ্গীতে যন্ত্রের ব্যবহার লঘুতম রাখা উচিত এই বহুদিনের প্রচলিত মতের ভিত গেল নড়ে।

এ সম্বন্ধে অবশ্য আমার নিজস্ব মত আছে। টিভি সিরিয়াল "গানের ওপারে" তে সামান্য পরিবর্তিত গায়কীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন এবং অনুষঙ্গে যন্ত্রের সুনির্বাচিত প্রয়োগ আমার বেশ ভাল লেগেছিল। রাগ সঙ্গীতের ভাব এনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া কিম্বা সমান্তরালে যন্ত্র এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করে কোন ঋতুর পরিবেশ সৃষ্টি করা এ সব প্রচেষ্টার কোনটিই আমার কাছে পীড়াদায়ক মনে হয় নি। আমার সবসময়েই মনে হয়েছে মহৎ সৃষ্টিকে কোন সীমার মধ্যে ধরে রাখা উচিত নয়। নতুন কল্পনার সূত্র পাওয়া যায় পুরনোর মধ্যে সন্ধান করলে। অতিউৎসাহীরা অনেক সময় মাত্রাবোধ হারিয়ে অসঙ্গত কিছু করে ফেলেন। সেটি অপরিণত শিল্পবোধের কারণে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে দীর্ঘ সহবাসের ফলে আমার চিন্তায় এত বাঁকবদল। যাকে অনেকদিন ধরে চিনি দিনে দিনে তারও নতুন নতুন পরিচয় আমার সামনে খুলতে থাকে ক্রমাগত। সেই ছোটবেলায় পড়া কবিতাতে থাকত ছবি যার মধ্যে আমার শিশুমন নিজের একটা জায়গা পেয়ে যেত। সে ছবির মিছিল রঙে সুরে ভাবে হৃদয় মস্তিষ্ক মগ্ন করে রেখেছিল যখন গড়ে ওঠার বয়সে রবীন্দ্রনাথকে নির্ভর করে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইতাম, – শিল্পরুচির পাঠশালায় নিজেকে শিক্ষিত করতে চাইতাম অর্থাৎ যখন লেনদেন ছিল বাইরের জগতের সঙ্গে।

তারপর একটা সময় এল যখন চারপাশের সীমানা হয়ে এল সংকুচিত, কণ্ঠ গান গাইতে অরাজি হল, মন জুড়ে নেমে এল সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা। তেমন এক বিষণ্ন অবসরে পাশে এল গীতবিতান। পাতা খুলে দিল, বলল "শুধু পড়ে যাও আমার গান।" সে পাতায় পেলাম একটি গান, "বুঝেছি কি বুঝি নাই বা সে তর্কে কাজ নাই/ভালো আমার লেগেছে যে রইলো সেই কথাই"। এ গান আমি কখনো শুনিনি। কিন্তু চমকে উঠে ভাবলাম এ কথাই তো বলতে চেয়েছি কত সময়ে। এই ভালো লাগাতে নিজেকে সঁপে দিতে পারলে অনেক অস্বস্তির শেষ।

কয়েক পৃষ্ঠা উলটিয়ে আর একটি গান পেলাম, এ গানটিও আমি আগে শুনিনি। "তোমার নয়ন আমায় বারেবারে বলেছে গান গাহিবারে ... গাই যে কেন কী কব তা,/কেন আমার আকুলতা – ব্যথার মাঝে লুকায় কথা, সুর যে হারাই অকূল পারে।" গান গাইবার আকুল ইচ্ছে জাগে মনে কিন্তু ব্যথায় কথা ডুবে যায়, সুর হয়ে যায় দিশাহীন – এমন খেই হারানো মনের কথা কবি পড়ে নিয়েছেন কেমন করে ? "বন্ধু, তুমি বুঝবে কি মোর সহজ বলা – নাই যে আমার ছলাকলা।/সুর যা ছিল বাহির ত্যেজে অন্তরেতে উঠলো বেজে ... কেমন করে করব বাহির মনের কথা।" কথাগুলি পড়ছি, সুর বাজছে মনের মধ্যে। সে সুর স্বরবিতানের পাতায় পাবো কিনা জানিনা। হয়তো আছে, থাকুক। যে সুরে ওই কথা মনের মধ্যে বাজছে তার জন্য অন্য শ্রোতার দরকার নেই। তবে শুধু "নিজেকে নিয়েই আছি", এমনই বা কবে হতে চেয়েছিলাম ? উত্তর পেয়ে গেলাম আর একটি স্বল্পশ্রুত গানের কটি কথায়।

"আছি রাত্রি দিবস ধরে দুয়ার আমার বন্ধ করে, / আসতে যে চায় সন্দেহে তায় তাড়াই বারেবার / তাই তো কারো হয় না আসা আমার একা ঘরে।" বাইরের জগত থেকে নিজেকে কোন নির্বোধ অভিমানে সরিয়ে নিচ্ছিলাম কে জানে ? একা ঘর বানিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে চাইছিলাম অবুঝের মত।

সঙ্গী পেয়ে গিয়েছি গীতবিতানকে। গানের ভিতর দিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করবার জাদুকাঠি হাতে পেয়েছি। এত অসংখ্য গান, সুর তার বেশ কিছু চেনা, কিছু কোনদিনই না শোনা। কিছু আসে যায় না তাতে। বিরাট এক ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়েছি তাতে অন্তহীন ছবি এঁকে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রত্যেকটির সঙ্গেই সুর মিলে যায় আমার ..., আমাদের। চিনে নিতে পারি আমাদের সব বয়েসের সখা রবীন্দ্রনাথকে। ছেড়ে যাবেন না কখনো এ বিশ্বাস আছে।

সৈমন্তী বিশ্বাস সান্যাল

আপন রবীন্দ্রনাথ

পৃথিবীর এখন অনেকগুলো অসুখ। একজন মানুষের যেমন অনেক রকম অসুখ ধরে, হঠাৎ করে – প্রেশার, সুগার, চোখটা গোলমাল করছে, হাঁটতে গেলে হাঁফ ধরে। পৃথিবীরও তেমনি একসাথে এতগুলো অসুখ ! তার সিম্পটোমগুলো আমরা সবসময় বুঝতে পারছি, তাই আমরাও ভালো নেই, যে ভালো আছে তাকে চোখ বন্ধ করে ভালো থাকতে হচ্ছে, কারণ চোখ খুলে পাশের মানুষকে এতো কাতরাতে দেখলে কি আর নিজেও ভালো থাকা যায় ?

ছোটবেলায় রূপকথার বইতে পড়তাম একটা হাঁসের দুটো মুখ। এক মুখ বলছে আমি বিষ ফল খাবো, অন্য মুখ বলছে তুমি তো শুধু তুমি নও, আমিও আছি। একজন বিষ ফল খেলে দুজনকেই মরতে হবে।

সমস্যাগুলোও যেন ঠিক তেমনি, ব্যক্তিগত বা দেশগত নয়, বিশ্বজনীন।

বেশ, এবার দেখি অসুখগুলো কী কী ? অসুখ ১) পরিবেশ দূষণ, ২) সামগ্রিক শিক্ষা সাধনার অবনতি, ৩) মানবতার হ্রাস, ৪) স্বার্থচিন্তা, ৫) অপরিনামদর্শিতা আরো আছে, অনেক অনেক আছে।

আর তার সিম্পটোমগুলো হলো যুদ্ধ, খরা, বন্যা, দাবানল, উষ্ণায়ণ, মহামারী, অতিমারী . . . ।

আচ্ছা, পৃথিবীর কোনো ডাক্তার হয় না ? ডাক্তার তো আছেন, তাঁরা ওষুধও লিখে দিয়ে গেছেন সময়ে, অসময়ে। তা মানলে তবেই না কাজ হবে,তবেই না আবার সুস্থতা ফিরে আসবে . . . ।

আমার "সংকলন" বই এর প্রবন্ধগুলো এমনই ভালো থাকার, সুস্থ থাকার প্রেসক্রিপশন মনে হয়।

ডাক্তারবাবুর নাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই বইয়ে সংকলিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নেওয়া শিক্ষা, সমাজ, প্রকৃতি, স্বদেশ, সাহিত্য সম্বন্ধীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। যার চর্চা আমাদের অচিরেই আলোর পথ দেখতে পারে . . .

"স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে" শিক্ষা বিষয়ক ("শিক্ষার হেরফের") এই প্রবন্ধে বারংবার তিনি শিক্ষার সাথে আনন্দের কথা বলেছেন, বইকে শুধু গলাদ্ধকরণ নয় তার প্রকৃত রসাস্বাদন, আত্তীকরণ ও যথার্থ পুষ্টি লাভের কথা বলেছেন। শিক্ষার দ্বারা যে প্রকৃতির সত্যরাজ্যের ও সাহিত্যের কল্পনারাজ্যের প্রবেশের ছাড়পত্র পাওয়া বাঞ্চনীয় তাও আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন।

"চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি তাতে আর সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ওই দুইটি পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না এ কথা অতি পুরাতন।" তিনি মনে করিয়ে দেন, আমরা যেমন যেমন পড়ছি তার সাথে সাথে যদি সেই বিষয়ে গভীর ভাবে ভাবিও এবং জীবনের সাথে সেই জ্ঞান সঠিকভাবে যুক্ত করতে পারি তবেই আমাদের শিক্ষা সার্থকতা লাভ করবে।

ভাষাশিক্ষার সঙ্গে ভাবশিক্ষার ও সেই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের রাসায়নিক মিশ্রণ হতে হবে – এমনি আশা তিনি লালন করেছেন।

'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে তিনি বলছেন, "জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ঐক্য"।

শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে তিনি আমাদের সচেতন করে দিচ্ছেন যেন আমরা প্রকৃত জ্ঞানের প্রদীপ থেকে দূরে না সরে যাই, মানুষের সাথে মানুষের সেতুগুলোকে নিজেদের অবহেলায়, অজ্ঞানতায় যেন জরাজীর্ণ না করে ফেলি।

বিশ্ব বরেণ্য বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন বিজ্ঞান সাধনায় কল্পনাশক্তির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনায়ও আমরা যেন তারই প্রতিধ্বনি শুনি, "আমাদের এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।"

শিক্ষাক্ষেত্রে এই কল্পনার পাশেই তিনি রেখেছেন সত্যকে। কাব্যের ক্ষেত্রে যেমন আমরা জানি, সত্যকে বাদ দিয়ে কল্পনা নিষ্ফল হয়ে পড়ে। তেমনি 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে বলছেন, "এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে।" কোনো সুবিধে, সম্মানের জন্য নয়, "মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্য।"

স্বদেশ গ্রন্থ থেকে নেওয়া 'নববর্ষ' প্রবন্ধ শুরু হচ্ছে এই বলে যে, "অধুনা আমাদের কাছে কর্মের গৌরব অত্যন্ত বেশি। হাতের কাছে হউক, দূরে হউক, দিনে হউক, দিনের অবসানে হউক, কর্ম করিতে হইবে।" এইটুকু পড়ে ভেবেছিলাম উনি নিরন্তর কর্মমুখর থাকবার কথা বলছেন, যে কর্মের দ্বারা সভ্যতা গড়ে ওঠে।

কিন্তু সেই ভুল ভাঙলো পরের অনুচ্ছেদে এসে। উনি বলছেন, "এখানে আশ্রমে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিলে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে। প্রকৃতিতে কর্মের সীমা নাই, কিন্তু সেই কর্মটাকে অন্তরালে রাখিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে। প্রকৃতির মুখের দিকে যখনি চাই, দেখি, সে অক্লিষ্ট অক্লান্ত, যেন সে কাহার নিমন্ত্রণে সাজগোজ করিয়া বিস্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসন গ্রহণ করিয়াছে।"

এতবছর আগেকার লেখা, অথচ কত সহজভাবে এখনকার ব্যস্ত, কর্মক্লান্ত সমাজকে বিশ্লেষণ করলো এবং সমাধানের পথও বাৎলে দিলো; প্রকৃতির মতো হতে বলা রয়েছে সেখানে। বলছে, কর্ম যেন ক্লান্তি, বিরক্তি ডেকে না আনে, তা যেন আমাদের সৌন্দর্যে, শান্তিতে, আনন্দে পৌঁছানোর একটা পথ হয়।

সুখ আর আনন্দ সম্বন্ধে 'পাগল' প্রবন্ধে উনি বলছেন, "আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়"; বর্তমানে সুখ, আনন্দ, কর্মক্ষমতা, ভালোবাসা, স্বাধীনতা সবই আমাদের আছে, তবু কোথাও যেন সদিচ্ছার অভাবে, সাহসের অভাবে, স্বার্থপরতার কারণে জীবনের ভারসাম্য আসছে না। এই অবস্থাকেই তিনি বলছেন,

"পানীমে মীন পিয়াসী

শুনত শুনত লাগে হাসি"

তাই বিধাতার কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনা করছেন, "আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও।" এই বিশ্বব্যাপী সংকটকালে ওনার সাথে সাথে আমরাও ঈশ্বরের কাছে সেই চিরন্তন প্রার্থনায় যোগ দিই, করজোড়ে; পৃথিবীর নিরাময়ের . . . ।

অদিতি ঘোষদস্তিদার

নূতন প্রাণের চর
ফাল্গুনী নাটকঃ একটি পর্যালোচনা

যৌবন – সে তো দুদিনের মায়া। শরীর জৈবিক নিয়মে কাল সমুদ্রে পাড়ি দিতে দিতে বদলাবে একের পর এক বন্দর – শৈশব, কৈশোর, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য হয়ে দিগন্তরেখায় হবে বিলীন। এ অমোঘ, অপরিহার্য, রদ বদল নেই। কিন্তু মনের যাত্রাপথটা যদি একটু বদলে দেওয়া যায় ? যদি সে নোঙর ফেলে যৌবনের ভাবনাতেই ! আমৃত্যু যদি উপাসনা করে আধুনিকতার, তবেই তো জরাজীর্ণ গাছের ডালে ডালে নাচবে যৌবনের আগুন, সাজবে সে গাছ নতুন পাতায়। ভাবনার দিগন্ত রাঙা হবে নব রবি কিরণে।

যা কিছু জীর্ণ, সংকীর্ণ সব ঠেলে সরিয়ে আনতে হবে নবজীবনের জোয়ার, গাইতে হবে যৌবনের জয়গান। এ যৌবন অনন্ত, এ শুধু চিন্তায়, মননে। ফাল্গুনী নাটক সেই অনন্ত যৌবনরসের বার্তা বাহক – এক অনন্য রবীন্দ্র নাট্য।

বলাকা কাব্যগ্রন্থ আর ফাল্গুনী নাটক – একই ভাবনার প্রতিফলন।

"ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা

আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা !"

এ যেন কবির আত্মদর্শন – যার প্রতিফলন ফাল্গুনীতেও।

জীবনের পাথর ছড়ানো পথে পথে চলে সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ খুঁজে বেড়িয়েছেন "ঝরনা ঝরানো" বাণী। শোকে দুঃখে জর্জরিত নিজেকে উজ্জীবিত করেছেন জীবনের মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে। বারে বারে শোকতাপভস্ম মেখে ফিনিক্স পাখির মত মেলে দিয়েছেন মহাবিহঙ্গডানা।

ফাল্গুনী নাটক তো তাই শুধু একটি নাটক নয় – এ নাটক হল নাট্যকারের নিজের চেতনার ভোলবদল – মনের জরার পলি কেটে আবার নদীর পাগলপারা বেগে চলা শুরু।

চল্লিশ পেরোতে না পেরোতেই কবির জীবনে এসেছে শোক আর দুঃখের প্লাবন। স্ত্রী, কন্যা, কনিষ্ঠ পুত্রবিয়োগে শরীর মন বিধ্বস্ত, মৃত্যু আর জরা যেন গ্রাস করে নিতে চাইছে সমগ্র সত্ত্বাকে। সেই মানসিক অবস্থাতেই লেখা "ডাকঘর" – যেখানে নাট্যকার যেন নিজেই অমল, রাজার চিঠির প্রতীক্ষায় যার দিন একটি একটি করে শেষ হয়। ব্যাধি পীড়িত শুধু অমল নয় – নাট্যকার নিজেও।

১৯১২ সালে রচিত হয় "ডাকঘর।"

এর পর পরই ঘটতে থাকে নানা যুগান্তকারী ঘটনা।

১৯১৩ তে নোবেল প্রাইজ, ১৯১৪ তে বেজে উঠল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের দামামা। ইউরোপ ভ্রমণকালে কবি উপলব্ধি করলেন সেখানকার অস্থিরতা, নতুন নতুন চিন্তার পরিবর্তন কবির মনে তুলল ঝড়। কবি এই দুঃসময়ে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করলেন উজ্জীবনের আদর্শে।

১৯১৪ সালেই প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় সবুজ পত্রের প্রকাশ। কবির কলমে দীপ্ত "সবুজের অভিযান।" কবি ধূসর রং সরিয়ে ঘটালেন মনের সবুজায়ন।

সেই ভাবনা প্রতিফলিত হল ১৯১৬ সালে প্রকাশিত চার চারটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে –

উপন্যাসঃ ঘরে বাইরে আর চতুরঙ্গ।

কাব্যগ্রন্থঃ বলাকা আর নাটক, ফাল্গুনী।

ফাল্গুনী রবীন্দ্রনাথের মানসিক ব্যাধিমুক্তির পরিচায়ক। নাটকের রাজা যিনি ভয় পান আসন্ন জরাকে তিনিও রবীন্দ্রনাথ আবার যৌবনের দূত কবিশেখরও তিনি নিজে।

বাকি সকল চরিত্র সর্দার, দাদা, অন্ধ বাউল কিংবা চন্দ্রহাস – প্রত্যেকে নাট্যকারের ভিন্ন ভিন্ন নতুন ভাবনার প্রকাশ।

ব্যক্তিগত বেদনাকে জয় করে কীভাবে নতুন ভাবনায় রাজা নিজেকে উত্তরণ করলেন সেটা নাট্য কাহিনিতে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট।

রাজা এক সন্ধ্যায় মাথায় একটি পাকা চুল দেখে যার পর নাই হতাশ – মনে ভয় এই বুঝি পেলেন মৃত্যুসংকেত ! রাজকার্যে মন নেই। বৈদেশিক দূতের আপ্যায়ন, দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজার সমস্যা সমাধান সব এখন গৌণ। শুধু মনে এক চিন্তা, যৌবন চলে যাবার যন্ত্রণা।

রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন বৈরাগ্যের। এই সুযোগে শ্রুতিভূষণের মত কিছু পারিষদ ব্যক্তিগত সুবিধে চরিতার্থ করতে চায়। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রীও অসহায়। ঠিক এমন সময় উপস্থিত হয় কবিশেখর। নেয় ত্রাতার ভূমিকা। রাজাকে বোঝায় যে রাজা যৌবনকে আজীবন ধরে রাখতে পারবেন মনে – নতুন ভাবনায় মনকে সরস করে ভোগাসক্তির উর্ধ্বে উঠে গিয়ে নতুন কর্ম যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লেই পাবেন অনন্ত যৌবনের স্বাদ। অমোঘ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবন করবে প্রত্যয়ী আত্মঘোষণা।

রাজার আদেশে কবিশেখর এরপর রচনা ও উপস্থাপনা করেন ফাল্গুনী নাটক।

এরপর শুরু হয় কাহিনির মধ্যে আর এক কাহিনি।

নবযৌবনের দল খুঁজতে বেরোয় অন্ধকার গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক আদ্যিকালের বুড়োকে। যে আর কেউ নয়, সে শীত, সে জরা। যে যৌবনকে করে জীর্ণ, সব ঔজ্জ্বল্য সব দীপ্তিকে করে মলিন ধূসর।

নবযৌবনের দলের প্রেরণা হল সর্দার, যে কিনা নিজে ছোটে না কিন্তু ছুটিয়ে বেড়ায়। এই দলের নেতৃত্ব দেয় প্রাণচঞ্চল চন্দ্রহাস। দলে একমাত্র বেমানান দাদা – যদিও বয়েসে সে সবার ছোটো কিন্তু আদপে সে অকাল বৃদ্ধ। পৃথিবীর আর সকল মানুষ তার জ্ঞানগর্ভ বাণীতে মুগ্ধ, শুধু নব যৌবনের দল বড় ভয় পায় দাদার নিরাবেগ অন্তসারশূন্য কাব্যকে।

দলে আছেন এক অন্ধ বাউল। যিনি মনের আলোয় পথ চিনে চন্দ্রহাস সহ গোটা দলটাকে পৌঁছে দেন গুহার ঠিকানায়। প্রেম আর প্রাণের আগুন নিয়ে চন্দ্রহাস প্রবেশ করে সেই গুহায় – নাটকের শেষে অবাক বিস্ময়ে দর্শক আবিষ্কার করেন জরা-বৃদ্ধ আর কেউ নয়, স্বয়ং সর্দার, নাম আবার যার নাকি "জীবন সর্দার !"

এই সত্যই উন্মোচিত হয় যে পেছন থেকে যাকে মনে হয় বৃদ্ধ, মনে হয় জরা আর মৃত্যু – সামনে থেকে আসলে সেই ই যৌবন, বারে বারে ফিরে আসা নবজীবন, উচ্ছল যৌবন আবেগের প্রেরণা।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি পত্রে (শিলাইদহ, ২০ মাঘ ১৩২২) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি এতই সহজ যে, ঘটা করে তার অর্থ বোঝাতে সংকোচ বোধহয়। জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয় – আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান – অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকচ্ছে, ডাল মরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন। ... প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না। ফাল্গুনীর যুবকের দল প্রাণের উদাম বেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্ছে। সর্দার বলছে, ভয় নেই, বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করি নে – আচ্ছা দেখ, যদি তাকে ধরতে পারিস তো ধর। প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে – চিরন্তন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেত।

ফাল্গুনী নাটকের রূপক ঃ

ফাল্গুনী পুরোপুরি রূপক নাট্য না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় রূপকধর্মী বা ম্যাজিক রিয়ালিজমের সাহিত্য জনপ্রিয় হবার আগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবনায় বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

জীবন সর্দার, চন্দ্রহাস, দাদা আর অন্ধবাউল এই চারটি চরিত্রই রূপকধর্মী।

পাত্র-পাত্রীর বর্ণনা নাটক অনুসারে এখানে দেওয়া হল। তাতে নাটকের মর্ম কিছুটা অনুধাবন করা যাবে।

তোমার নাটকের প্রধান পাত্র কে কে।

এক হচ্ছে সর্দার।

সে কে। যে আমাদের কেবলই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর-একজন হচ্ছে চন্দ্রহাস।

সে কে।

যাকে আমরা ভালোবাসি – আমাদের প্রাণকে সে-ই প্রিয় করেছে।

আর কে আছে।

দাদা – প্রাণের আনন্দটাকে যে অনাবশ্যক বোধ করে, কাজটাকেই যে সার মনে করেছে।

আর কেউ আছে ?

আর আছে এক অন্ধ বাউল।

অন্ধ ?

হাঁ মহারাজ, চোখ দিয়ে দেখে না বলেই সে তার দেহ মন প্রাণ সমস্ত দিয়ে দেখে।

প্রমথনাথ বিশীর মতে, সর্দার বা "জীবন সর্দার" বলিতে রবীন্দ্রনাথ জীবন বা "লাইফ প্রিন্সিপল" বুঝিয়াছেন।

জীবন সর্দার নব যৌবনের দলকে চালিত করেছে জরাবৃদ্ধকে ধরে আনার জন্যে, আবার সেই অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর বুড়োর পরিবর্তে। সেই আসলে জীবন, চক্রের মত ঘুরে চলেছে। চন্দ্রহাসের প্রশ্নের উত্তরেই ফুটে উঠেছে সেই ভাব।

গুহা থেকে সর্দারকে বেরোতে দেখে বিস্মিত চন্দ্রহাসের প্রশ্ন

তবে তুমিই চিরকালের ?

হাঁ

আর আমরাই চিরকালের ?

হাঁ।

এতো বড় আশ্চর্য ! তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম !

চন্দ্রহাস, নব যৌবনের প্রিয় সখা প্রেমের প্রতীক। প্রেমের স্পর্শ না পেলে জীবনের দুর্বার গতি ব্যাহত হয়। চন্দ্রহাসের মধুর পরশেই নব যৌবনের দল উদ্দীপিত হয়েছে।

দাদা বয়েসে সবার ছোট হলেও মনে মনে বৃদ্ধ। কিছু আপাত প্রাজ্ঞ মানুষের জরা যে শরীরে নয়, মনে, সেটা বোঝাতেই দাদার চরিত্রের অবতারণা। এই ধরণের মানুষই আধুনিক ধ্যান ধারণার প্রতিকূলে।

অন্ধ বাউল হচ্ছেন প্রজ্ঞা বা প্রকৃত জ্ঞান। অন্ধ বাউল চোখে দেখার প্রথা ছেড়েছেন বহুকাল, তাই জীবনের স্বরূপ তাঁর মননে সুস্পষ্ট।

নাটকের স্থানগুলিও রূপকধর্মী। প্রথম দৃশ্যের স্থান পথ, দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান ঘাট, তৃতীয় দৃশ্যের স্থান মাঠ, চতুর্থ দৃশ্যের স্থান গুহাদ্বার।

পথঃ জীবনের গতি এই পথে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা ওঠা পড়া হোঁচট খাওয়া এই পথেই। জীবনের স্বরূপকে পথের সংকেতে ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই পথেই নব যৌবনের দল উৎসব করতে বেরিয়েছে, ভয় ডর পুঁথি পণ্ডিত ছেড়ে মেতেছে বুড়ো খোঁজার খেলায়। জীবনের প্রথম পর্যায়েই তো নেওয়া যায় এই রিস্ক।

ঘাটঃ জীবনের শেষপ্রান্ত। ঘাটের মাঝি বুলি সর্বস্ব বিধানদাতার প্রতীক, যারা বোঝে না যে জীবনের তাৎপর্য, জানে না যে মৃত্যুতেই জীবনের শেষ নয়।

মাঠঃ স্থিতির প্রতীক। এখানে এসে নব যৌবনের দলের সন্দেহ জাগে, স্থির করে "পুঁথি ছাড়া আর এক পা চলা নয়। আমরা চলব না।"

গুহাঃ মৃত্যুর প্রতীক, গুহার অন্ধকার মৃত্যু রহস্য।

নাট্যকারের নিজের ভাষায়

"প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে, সেই প্রাণকেই নূতন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে, যৌবনকে বার বার হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফালগুনের মহোৎসবের মহা সমারোহ তো মারা যেতো।"

ফাল্গুনী নাটকের গান

"ফাল্গুনী"র আর একটি বৈশিষ্ট্য গানের আধিক্য। হয়ত ইউরোপের মিউজিক্যাল ধরণের কিছু জিনিস কবির মননে ছিল।

প্রতিটি গান কিন্তু একই জীবনবোধ দিয়ে তৈরি, একই মালার ষোলটি কুসুম। প্রাণের জীর্ণতাকে ঝেড়ে ফেলে আধুনিক জীবনের জয়গান। বলাকা কাব্যের মত ফাল্গুনীতেও একদিকে বের্গসঁ-র গতিতত্ত্ব আর অন্যদিকে উপনিষদের চরৈবেতির গতিময়তার একাকার হয়ে গেছে।

তবে চিরকালীন যৌবনের বাণীর প্রচার ফাল্গুনীর মূল বিষয় হলেও রবীন্দ্রনাথ গোঁড়ামি আর কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে জেহাদ স্পষ্ট করে গেছেন গানে আর নাটকের ছত্রে ছত্রে। দাদা, মাঝি বা কোটাল চরিত্রের অবতারণা করে নাট্যকার জগদ্দল পাথরের মত সামাজিক চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে হেনেছেন তীব্র শ্লেষ।

"সবুজের অভিযানে"র
"চিরযুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি . . . "
সেই ভাবনা আরো তীব্রভাবে ফাল্গুনীর গানে সোচ্চার,
ভালোমানুষ নই রে মোরা
ভালোমানুষ নই।
গুণের মধ্যে ওই আমাদের
গুণের মধ্যে ওই।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কই নে মোরা
উলটো কথা কই।
জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে
সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি,
রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা,
রাখি নে ভাই ফলের আশা,
আমাদের আর নাই যে গতি
ভেসেই চলা বৈ॥

আধুনিকতা আর চিরনূতনের প্রতীক ফাল্গুনী নাটক রচনার একশোরও বেশি বছর পরেও একই ভাবে প্রাসঙ্গিক, কালজয়ী।

তথ্যঋণঃ

১। বিশী প্রমথনাথ। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহঃ দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতাঃ মিত্রালয়, ১৯৫১

২। ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা। কলকাতাঃ ওরিয়েন্ট বুক, ১৯৬০

৩। সেন সুকুমার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলকাতাঃ ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৫৬

৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলীঃ দ্বাদশ খণ্ড। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৯৬০

সুজয় দত্ত

কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে

হ্যাঁ, বেছে বেছে ঠিক কাল রাতের বেলাতেই এল। আর তখন তুমি কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেউই আমার সঙ্গে ছিল না। কারণ আমি ছিলাম স্নানঘরে। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আয়েস করে উষ্ণ জলে ধারাস্নান আমার স্বভাব, তাতে ঘুমটা ভাল আসে। কিন্তু অনেকে যেমন বাথরুমের বন্ধ দরজার আড়ালে গেলেই কিশোর, হেমন্ত বা শানু – কোনো একটা কুমার হয়ে যায় (কিংবা একসঙ্গে তিনটেই), এমনিতে আমার সে-অভ্যেস নেই। তবে কাল রাতে দেখলাম শাওয়ার থেকে মাথায় জল পড়ছে আর মনের মধ্যে গান ফোয়ারার মতো উছলে উঠছে। কে জানে কেন ? হয়তো তারিখটা বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম মাসের পঁচিশ তারিখ ছিল বলেই। যাইহোক, গানগুলোও আবার তেমনি বিচ্ছু ! শুধু মনে আসবি আয় – না মন থেকে গলায়, গলা থেকে মুখে এসে রাতদুপুরে বাথরুমটাকে একেবারে ষ্টুডিও বানিয়ে ফেলল ! ভাগ্যিস আশপাশে কেউ ছিলনা। নাহলে নির্ঘাত পড়শীদের কেউ না কেউ আমার নামে "গান ভায়োলেন্স"-এর মামলা করে দিত। কারণ আমার গলাটা অসুরের মতো না হলেও সুর-টুর ঠিক তেমন ।

যাকগে, প্রথম কোন গানটা মনে এল – সেই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু শক্ত নয়। দৃশ্যটা কল্পনা করলেই বুঝে ফেলা যাবে। আমার বাথরুমের শাওয়ারের প্যাঁচটা পুরো খুলে দিলে বেশ তোড়ে জল পড়ে। সুতরাং তার তলায় দাঁড়িয়ে যে "শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে" গানটা আগে মাথায় আসবে, সেটা বলাই বাহুল্য। অবশ্য "সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণ ধারা"ও হতে পারত অনায়াসে। এখন, শ্রাবণের কথা মনে হলে আষাঢ়ই বা বাদ থাকে কেন ? বিশেষতঃ "বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এল" গানটার সঙ্গে যখন ছোটবেলার একটা মজার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেই বয়সে গীতবিতান-টিতবিতান তো পড়া ছিল না, তাই এই গানটা শুনলেই চোখের সামনে যে ছবিটা ভেসে উঠত সেটায় "ষ" নয়, ছিল "চ"। অর্থাৎ আচার। এর আরও একটা কারণ ছিল। প্রতিদিন আমাদের প্রাইমারী স্কুলের গেটে টিফিনের সময় এক হজমিঅলা আসত তার হজমিগুলি, আচার, মুখশুদ্ধির পসরা নিয়ে। পাঁচপয়সা দশপয়সা দামের সেইসব মুখরোচক আচার আমাদের হাতে আসত যে ঠোঙায়, সেটা প্রায়ই দেখতাম তখনকার নামকরা কাগজ "যুগান্তর"-এর ছেঁড়া পাতায় তৈরী। তাই "যুগ" আর "আচার"-এর মধ্যে মনে মনে একটা সম্পর্ক তৈরীই ছিল। টিফিনের সময়কার সেই প্রাত্যহিক আচার-মুহূর্তগুলোয় সাধারণতঃ আমার সঙ্গী থাকত প্রিয় বন্ধু নীলোৎপল আর নবেন্দু। ক্লাসে পাশাপাশিই বসতাম আমরা। অতএব "আষাঢ়" প্রসঙ্গে যদি এর পরেই "নীল নবঘনে আষাঢ়-গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে" গানটা মনে আসে, আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে কি ? এ-প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, সেই হজমিঅলার কাছে মাঝেমধ্যে মিষ্টি মিষ্টি তিলের নাড়ুও পাওয়া যেত।

বাঙালীমাত্রেই আচার শুনলে তৎক্ষণাৎ দুটো ফলের নাম বলে ওঠে – আম আর কুল। আর কুল বললেই সরস্বতী পুজোর কথা স্মৃতি ঠেলে উঠে আসতে বাধ্য। ওই পুজোর সঙ্গে যে কুল খাওয়ার ব্যাপারটা ভীষণভাবে জড়িত। পুজো হওয়ার আগে কুল খাওয়ার ওপর কতরকম নিষেধাজ্ঞা। এই সরস্বতী পুজোর প্রসাদে কিন্তু আরও দুটো জিনিস অবধারিতভাবে থাকত। তিলুয়া আর কদমা। সেই কিটকিটে মিষ্টির শক্ত শক্ত ডেলাগুলোকে কচি কচি দাঁতের জোরে কড়মড় করে চিবিয়ে খেতে কী দারুণ মজা। এই কদমার সূত্রে হঠাৎ খেয়াল হল "বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান" গানটা, যদিও কদমা আর কদমফুল মোটেই কাছাকাছি জিনিস নয়, আর পুজোর প্রসাদে আমার ভাগে যে কদমাগুলো পড়ত আমি মোটেই সেগুলো কাউকে দান করতাম না। এই গানটা আমাদের স্কুলে গরমের ছুটি পড়ার ঠিক আগে মে মাসে রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে আমাদের গানের টিচার বীথিদি অনেকসময় গাইতেন। এর সঙ্গে আরও একটা বাদল-বিষয়ক গানও শুনতাম তখন ওঁর গলায় মাঝে মাঝে – "বাদল বাউল বাজায় বাজায় বাজায় রে"। প্রাইমারী স্কুলে

গানের ক্লাসে এই গানটা আমাদের তোলানোর চেষ্টা করতেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রতিবারই ওই "বাজায় বাজায় বাজায়" বলার সময়ই ঠিক আমাদের ক্লাস শেষের ঘন্টাটা জোরালো শব্দে বেজে উঠত। শুধু তাই নয়, যে স্কুলকর্মীর ওপর দায়িত্ব ছিল সব পিরিয়ড-শেষে ঘন্টা বাজানোর, তার নাম শুনেছিলাম বাদল বিশ্বাস। অতএব মজাটা দ্বিগুণ হত।

এর পর যে গানটা দুম করে মনে এল, সেটা সম্ভবতঃ ওই "কদম ফুল"-এর "ফুল" শব্দটার জন্য। "ফুল তুলিতে ভুল করেছি প্রেমের সাধনে"। তবে গানটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক ছিলনা, কারণ তারপরেই নজর করলাম গান ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে আমি আমার চিরকালের একচেটিয়া নিম সাবানের বদলে সহধর্মিণীর "ফেয়ার অ্যান্ড লাভলী" সাবানটা গায়ে ঘষছি। অর্থাৎ প্রেমের সাধনে ভুল না করলেও নিমের সাবানে অবশ্যই ভুল হয়েছে। "সাধনে" কথাটার সূত্রে যেই আমার অতিপ্রিয় গান "পদপ্রান্তে রাখ সেবকে, শান্তিসদন সাধনধন দেব দেব হে" গুনগুন করা শুরু করেছি, অমনি খেয়াল হল – না, আমি তো আমার সেবককে পদপ্রান্তে রাখিনি। অর্থাৎ শাওয়ারের নীচে যাওয়ার জন্য পর্দার ঘেরাটোপে ঢোকার আগে পায়ের চপ্পল দুটো ঠিক সামনেই খুলে রাখিনি। সুতরাং স্নানশেষে গা মুছে বেরিয়ে ছপ ছপ করে জলপায়ে বাথরুমের দরজা অবধি গেলে তবে সেদুটো পাওয়া যাবে।

গানের ঘোরে কতক্ষণ বাথরুমে কাটিয়ে ফেলেছি জানিনা, হঠাৎ দেখি বন্ধ দরজায় দুম দুম ধাক্কা। এরকম হলে তো একটা গানই মনে পড়তে বাধ্য – "কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে ? এ নিশীথকালে কে আসি দাঁড়ালে ?", যদিও তার পরের কথাটা ("চিনিতে পারিনি তাহারে") ভাবার আর সুযোগ হলনা। কারণ গিন্নীর অসহিষ্ণু গলা জোরালোভাবে ধেয়ে এল, "কী হচ্ছেটা কী ছাতার মাথা এতক্ষণ ধরে ভেতরে ?" ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু নাঃ, থাক। গানের কল্পলোকের সুরধুনীতে ভাসছিলাম এতক্ষণ, সেখান থেকে আচমকা পুরো ব্যাপারটাকে এরকম রুক্ষ, ঊষর বাস্তবভূমিতে এনে ফেলব না। বরং ধরে নেওয়া যাক বাড়ীর কর্ত্রী বাথরুমের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মধুর স্বরে গাইছেন, "খোলো খোলো দ্বার, রাখিও না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে"। তবে সমস্যা হল, তার পরের লাইনে যে নির্দেশগুলো রয়েছে ("দাও সাড়া দাও, এইদিকে চাও, এস দুই বাহু বাড়ায়ে") সেগুলো সব এইমুহূর্তে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা যাবেনা। বিশেষতঃ শেষেরটা। দুহাতে পরণের ভিজে তোয়ালেটা কোনোক্রমে ধরে আছি, তাই এখন দুবাহু বাড়ায়ে যেতে গেলে মুশকিল হবে।

বাথরুমের আলোর সুইচটা দরজার বাইরে। সেটায় ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে গিন্নীর হাত পড়ে যাওয়ায় আলো গেল নিভে। আমি আর কী করি, সেই অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে আর "বঁধু দয়া কর, আলোখানি ধরো হৃদয়ে, বঁধু দয়া কর" গাইতে গাইতে তাড়াতাড়ি বেরোলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঢুকে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ওই একচিলতে সময়ের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম ওর সারা মুখে দোলখেলার রঙের মতো কেক মাখানো। ওঃ, তাহলে এই ব্যাপার ? বন্ধুর বাড়ীতে তাদের বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গেছিল, সেটা জানি। সেখানেই তাহলে এই হাল হয়েছে। নাহলে এতো রাতে শাওয়ারে ঢোকা তো তেনার ধর্ম নয়। যাইহোক, ভেতর থেকে আসা শাওয়ারের শব্দটা শুনে ওখান থেকে চলে যেতে যেতে আপনমনেই বলে উঠলাম "তোমার হল শুরু, আমার হল সারা"। এইভাবেই তো দিনের পর দিন ফ্ল্যাটের একমাত্র বাথরুমের বাথটবে, শাওয়ার কার্টেনে, এমনকী মাঝেমাঝে অসাবধান হলে মেঝেতেও "তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা"। গত পঁচিশ বছর ধরে এভাবেই চলছে দুজনের এক বাথরুম নিয়ে কাড়াকাড়ি। হ্যাঁ, পঁচিশ বছর। এই বছরের বাইশে শ্রাবণেই আমাদের বিয়ের রজতজয়ন্তী।

অদিতি ঘোষদস্তিদার – পেশায় গণিতের অধ্যাপিকা। নেশা লেখা। বাস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে। আনন্দবাজার, সানন্দা সহ সারা পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি থেকে প্রকাশিত অভিব্যক্তির সম্পাদিকা। আমেরিকার মিচিগান থেকে প্রকাশিত উদ্ভাস পত্রিকার এবং কলকাতার কাফে টেবিল প্রকাশনার অবসর পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতেও যুক্ত। প্রিয় বিষয়ঃ ছোট গল্প, অণুগল্প।

Ananda Sen — Ananda is a Professor of Biostatistics at University of Michigan. Ananda also passionately pursues the hobby of acting whenever he can. When feeling stressed, he takes recourse to the Abhro keyboard on his desktop and types up Bengali poems. He is a regular contributor to Batayan. Ananda lives in Ann Arbor, Michigan with his wife and two kids.

মানস ঘোষ — মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক''। এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার দুটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে।

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় – একজন কবি, গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

পল্লববরন পাল — জীবিকাসূত্রে স্থপতি। বিদেশে আন্তর্জাতিক কন্সাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চিফ্ আর্কিটেক্ট হিসেবে ২০১৮ সালে অবসর নিয়ে ফিরেছেন। সঙ্গীত নাটক চিত্রশিল্প সহ সাহিত্যের আকৈশোর হোল্‌সেল্ প্রেমিক। নয় নয় করে এ যাবৎ আঠারোটি গ্রন্থের রচয়িতা- যার মধ্যে একটি গদ্যউপন্যাস, একটি পদ্য উপন্যাস। কিন্তু আদপে এডভেঞ্চার প্রিয় আপামাথা কবি। এক টেবিলে ঠায় বসে থাকার পাব্লিক নন। নিজস্ব কাব্যিক ভাষাশৈলিতে ইদানিং প্রবন্ধ ও লিখছেন 'অনুষ্টুপ' 'আরেক রকম'- র মতো নামী পত্রিকায়।

Pritha Banerjee — is a dancer, poet and writer. She lives in Sydney, Australia.

প্রিয়দর্শী মুখোপাধ্যায় – অধ্যাপক, জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লী।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় — শিকাগোর বাসিন্দা। পেশায় শিক্ষিকা। আর নেশায় পড়ুয়া। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখাপড়া করার অভ্যাস আপাতত। রঞ্জিতার প্রেম হল বাংলা ভাষা, সাহিত্য আর মাঝে মাঝে কিছু লেখালিখি। রঞ্জিতা 'বাতায়ন' পত্রিকার গোষ্ঠী সম্পাদিকা। শিকাগোর স্থানীয় সাহিত্যগোষ্ঠী উন্মেষের সঙ্গে উনি প্রায় এক দশক ধরে যুক্ত। সহলেখিকা হিসেবে রঞ্জিতার দুটি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে — ''Bugging Cancer'' আর ''Three Daughters Three Journeys''। সাহিত্যের হাত ধরে ভৌগোলিক সীমানার বেড়া ভাঙায় বিশেষ আস্থা রঞ্জিতার।

রূমঝুম ভট্টাচার্য্য – রূমঝুম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একান্ত অনুরাগী। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, ছোটগল্প ইত্যাদি নানা শাখায় লেখালেখির অভ্যেস আছে তাঁর। তাঁর লেখা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়। প্রবাসী রূমঝুম বাংলা সাহিত্যকে ভালবেসে চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সৈমন্তী বিশ্বাস সান্যাল – সৈমন্তী আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে একটি পরিচিত নাম। তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ভালবেসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন তিনি।

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় – ঐতিহ্যময় শহর চন্দননগরের স্থায়ী বাসিন্দা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির স্নাতক। ১৯৯৬ সালে প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'দিবারাত্রির কাব্য' পত্রিকায়। ২০০১ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। 'আনন্দবাজার', 'বর্তমান', 'আজকাল', 'প্রতিদিন', 'তথ্যকেন্দ্র', 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ছাড়াও, 'অনুষ্টুপ', 'কুঠার', এবং 'মুশায়ারা'-র মতো বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনেও তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশের ধারা অব্যাহত। প্রকাশিত উপন্যাস পাঁচটি, গল্পগ্রন্থ তিনটি, এবং কবিতার বই একটি।

শমীন্দ্র ভৌমিক – একজন কবি ও ছড়াকার।

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

স্নিগ্ধা সেন পারিবারিক সূত্রে ওপার বাংলার হলেও আজন্ম কলকাতারই বাসিন্দা। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন, প্রথমে ভিক্টোরিয়া ইন্সটিউশনে, এবং পরে একাধিক ওপেন ইউনিভার্সিটিতে। সাহিত্য চর্চার শখ বহুদিনের। এই আশী উত্তর বয়সেও সে চর্চা চলছে পূর্ণ উদ্যমে। কলকাতার অনেক পত্র পত্রিকায় লেখা বেরিয়েছে – গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। সাম্প্রতিক প্রকাশিত দুটি বই – "হ্যামলেট" এবং "ওদের কি খেতে দেবে"।

সুজয় দত্ত – ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

অধমের নাম **সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়**। পার্থিব বাসিন্দা। ৯টা-৫টার চাকর। পিদিমের মত টিম্‌টিমে বুদ্ধি, তা'ও নেভে না !!

শুভ্র দত্ত – সিয়াটেলের বাসিন্দা, পেশায় রোবটিক্স প্রযুক্তিবিদ, আর নেশায় লিমেরিকবি, অর্থাৎ লিমেরিক লেখেন এমন কবি।

তার চেয়ে একটু বিশদে বলতে গেলে – শুভ্র দত্ত আদতে কলকাতার ছেলে, পরে সিয়াটেল শহরের প্রায় তিন-দশকের বাসিন্দা। নানা সময়ে নানারকম পেশায় পা গলিয়েছেন – মহাকাশ বিজ্ঞান, ক্যামেরার ব্যবসা, বায়োমেডিকাল প্রযুক্তি, রোবটিক্স, ইত্যাদি প্রভৃতি। নেশাও নানান ধরণের; তার মধ্যে আছে ছবি তোলা, বাংলা বই পড়া, যন্ত্রপাতি তৈরী করা, ওয়েবসাইট বানানো, এবং অনর্থক অর্থহীন লিমেরিক লেখা। বাংলিমেরিক ডট কম (BangLimeric.com) ওয়েবসাইট ওনারই সৃষ্টি।

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি', 'অমৃতের সন্তানসন্ততি', 'ঈশ্বরকে স্পর্শ', 'মায়াবী পৃথিবীর কবিতা', 'সুধাসাগর তীরে', 'সে মহাপৃথিবী', 'আকাশকুসুমের পৃথিবী'। কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্পও করতে ভালবাসেন।

প্রায় ১১০ বছর আগের কথা। কবিগুরু চিঠি লিখছেন জ্যোতিদাদাকে, "ভাই জ্যোতিদাদা, আমরা আমেরিকায় এসে পৌঁছেছি। সে কারণে তোমার চিঠি আসতে দেরি হয়েছে। ... আমরা একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। বৌমা সেই বাড়ির কর্ত্রী। তাকে নিজেই রান্না করতে হচ্ছে।" চিঠির উপরে ঠিকানা লেখা – ৫০ হাই স্ট্রিট, আর্বানা, ইলিনয়, ইউএসএ। সময়টা ১৯১২ সাল। আমেরিকায় এসে ছোট্ট কৃষিনির্ভর এলাকা আর্বানাতে রবীন্দ্রনাথ ভাড়া নিলেন একটি বাড়ি। একটানা ৬ মাস (নভেম্বর, ১৯১২-এপ্রিল,১৯১৩) থেকেছেন তিনি সেই বাড়ীতে। গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ তিনি ওই বাড়ীতে বসেই করেন। পত্রালাপ চলে নানা বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে। কবি উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস আছেন সেই তালিকায়।

পরে ১৯১৬ সালে আবারও সেই বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০৩ সাল থেকে এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই বাড়ীর মালিক ছিলেন Stan শার্লো নামে এক মার্কিন ভদ্রলোক। সম্প্রতি কবিগুরুর অমূল্য স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়ীটি তাঁর কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন কাজল মুখোপাধ্যায় ও মৌসুমী দত্তরায় নামের দুই প্রবাসী বাঙালি। প্রবাসে রবীন্দ্রচর্চায় ও রবীন্দ্র গবেষণায় পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলির যোগসূত্র স্থাপনে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার সম্ভবনা অনস্বীকার্য।

"বাতায়ন" পত্রিকার পক্ষ থেকে কাজল ও মৌসুমীকে সাধুবাদ জানাই এই কাজের জন্য। অনেক ধন্যবাদ ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্র বাসভবনের আলোকচিত্র আমাদের প্রকাশিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য।

“যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে”

ISBN 978-0-6487688-9-0